কর্ম্মক্ষেত্র

শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত

কলিকাতা :

সিটী বুক সোসাইটী,

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্।

১৩১০

মূল্য ১।০ (এক টাকা চারি আনা) ।
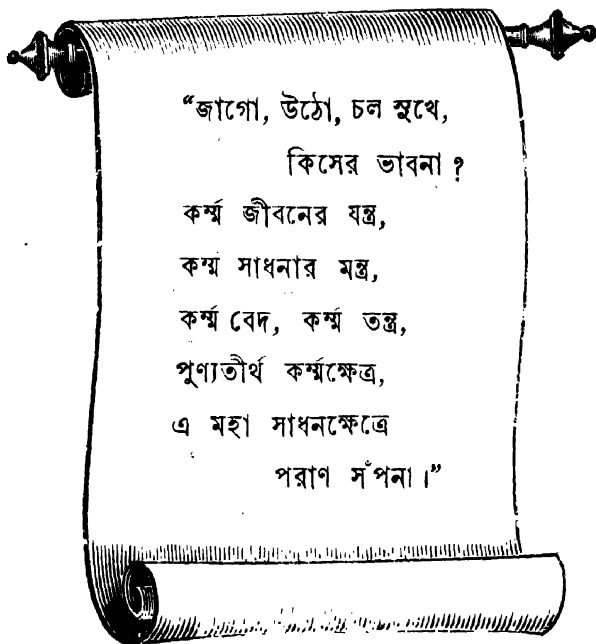
"জাগো, উঠো, চল স্থখে,
কিসের ভাবনা ?
কর্ম্ম জীবনের যন্ত্র,
কর্ম্ম সাধনার মন্ত্র,
কর্ম্ম বেদ, কর্ম্ম তন্ত্র,
পুণ্যতীর্থ কর্ম্মক্ষেত্র,
এ মহা সাধনক্ষেত্রে
পরাণ সঁপনা।"

"Work is the mission of man on this Earth. A day is ever struggling forward, a day will arrive in some approximate degree, when he who has no work to do, by whatever name he may be named, will not find it good to show himself in our quarter of the Solar System, but may go and look out elsewhere if there be any idle planet discoverable"—**Carlyle.**

সূচীপত্র

নিবেদন

আমাদের স্বদেশীয় যুবকগণের মঙ্গলকামনায় কর্ম্মক্ষেত্র রচিত ও প্রকাশিত হইল। ইহাতে কর্ম্মবাদের জটিল দার্শনিক কোন কথার আলোচনা করা হয় নাই। এ গ্রন্থের সে উদ্দেশ্য নহে। মানবের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি নামক ঈশ্বরদত্ত এক মহাশক্তি বিদ্যমান আছে; এই কথাটী বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের প্রথমে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্ব কর্ম্মের পূর্ব্বে আত্মশক্তি অবগত হওয়া আবশ্যক। মানব বিশ্বাসের দাস। মানুষ যদি সরল ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাহার ইচ্ছাশক্তি আছে, আর সেই মহাশক্তির সাহায্যে সে নানা কঠোর ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিতে পারে, তবে সে কেন বিঘ্ন বাধায় প্রতিহত হইয়া অদৃষ্টের দোষ দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে? যাহার মানবের ইচ্ছাশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে। উপদেশ ও আদর্শের দ্বারা তাহাকে উদ্দীপিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কর্ম্মের মূলে সঙ্কল্প, মধ্যে সাধনা এবং শেষে সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। স্বদেশের কর্ম্মবীরগণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যে সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে, আশা, অধ্যবসায়, সাহস, নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সাধনা করিলে, আমাদের যুবকগণ অনুরূপ সিদ্ধিলাভ করিবেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে বরণীয় হইবেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরগণের ধারাবাহিক জীবনী দেওয়া হয় নাই। ইহা জীবনী সংগ্রহ নহে। যে সকল মহাত্মার আদর্শ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই বিস্তৃত জীবনী আছে। সুদক্ষ চরিতাখ্যায়কগণ তাঁহাদের জীবনের সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া-

গিয়াছেন সুতরাং সংক্ষেপে সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। এই গ্রন্থ রচনাকালে এই সকল গ্রন্থকারের সংগৃহীত জীবনী হইতে অনেক সাহায্য লওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য এস্থলে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

এই গ্রন্থে কর্ম্মের তিনটী অবস্থা দেখান হইয়াছে। প্রথম সঙ্কল্প, দ্বিতীয় সাধনা এবং তৃতীয় সিদ্ধি। যে সকল কর্ম্মবীরের আদর্শ এখানে সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা ভারতের শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তাঁহাদের বিশেষ পরিচয়, জন্মমৃত্যুর কাল, জন্মস্থান বা পিতৃমাতৃকুলের বিবরণ, এখানে দেওয়া হয় নাই। সে সকল কথা তাঁহাদের জীবনীগ্রন্থে আছে। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মসমূহের সঙ্কল্প কিরূপ অবস্থার মধ্যে করা হইয়াছিল, কি প্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সে গুলির সাধনা হইয়াছিল, এবং শেষে সে গুলি সিদ্ধ হইয়াছিল কি না কর্ম্মক্ষেত্রে এই সকল কথা প্রধানতঃ বলা হইয়াছে। আশা করা যায়, স্বদেশীয় যুবকগণ কার্য্যকালে কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে এই সকল পুণ্যপ্রসঙ্গ পাঠে সৎকর্ম্মের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইবেন, আশা অধ্যবসায়, সাহস নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সাধনায় রত থাকিবেন এবং শেষে ভগবানের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করিবেন। ইতি—

আরা,
চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩০৯।

গ্রন্থকারস্য

কর্ম্মক্ষেত্র।

শক্তি-পরিচয়

মানব কর্ম্মশীল। নিষ্ক্রিয় মানবের অস্তিত্ব কষ্টকল্পনার বিষয়। নিষ্ক্রিয় মানব শব। ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক আর অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক মানবের অন্তরে, বাহিরে নিরন্তর কোন না কোন কার্য্য হইতেছে। ধমনীতে রক্ত সঞ্চলন, ফুসফুসে শ্বাস ক্রিয়া, মস্তিষ্কে চিন্তনকার্য্য হইতে, ভোজন, ভ্রমণ, ভূমি-কর্ষণ, গৃহনির্ম্মাণ, লৌহবর্ত্ম বিস্তার, সেতুবন্ধন, সমুদ্রে তাড়িতবার্ত্তাবহ তার বিস্তার, আকাশে ব্যোমযানাদিতে গমনরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ অদৃশ্য বা দৃশ্য কোন না কোন কর্ম্মে মানব নিয়ত ব্যাপৃত আছে। এই সকল কার্য্যকে আমরা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ইহাদের কতকগুলি স্বতঃ হইতেছে, ইহারা মানবের ইচ্ছার অধীন নহে, যেমন রক্তসঞ্চলন, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, দৈহিকবর্দ্ধনাদি; আর অপর গুলি মানবের ইচ্ছা অনুসারে হইতেছে, ইহারা মানবের ইচ্ছাসাপেক্ষ। যে সকল কার্য্য মানবের ইচ্ছার অধীন নহে, এখানে সেগুলি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। কিন্তু যে সকল কার্য্য মানবেচ্ছার অধীন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় সেইগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই সকল কার্য্য, সূচনা হইতে সিদ্ধি পর্য্যন্ত, কি পরিমাণে ইচ্ছাশক্তিসাপেক্ষ তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কর্ম্মের সহিত ইচ্ছাশক্তির সম্বন্ধ বুঝা

আবশ্যক। অন্যথা আত্মশক্তির অজ্ঞতাজনিত বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। নিজের দুর্ব্বলতা কোথায় এটী যেমন মানুষের জানা উচিত তেমনই কোথায় তাহার শক্তি সেটীও জানা আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, যে দরিদ্র ভূস্বামী নিজ অধিকৃত ভূমিতে গুপ্তধনের অস্তিত্বের কথা অবগত না থাকায়, দুঃখে দারিদ্র্যে দিন যাপন করে। সেইরূপ অনেকে নিজের শক্তি কত তাহা না জানিয়া সংসারে সামান্য বিঘ্ন বাধায় অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে, উৎসাহিত করিবার পূর্ব্বে, ইহাদিগকে ইহাদের আত্মশক্তির কথা বুঝাইয়া দিলে অধিক উপকার হয়। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় ভাবের উদয় হইতে পারে, ভাব প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মে পুনঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে—কিন্তু সে প্রয়াস মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত ব্যক্তির হস্তপদ সঞ্চলনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়। প্রয়াস স্থায়ী করিতে হইলে, যুক্তিমূলক বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে। মানব বিশ্বাসের দাস।

কূটতার্কিকের বাগ্‌জালের বাহিরে আমরা সকলে সরলভাবে মানবেচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। যদি তাহা না করিতাম, তবে অপরাধ, পাপপুণ্য আর দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত, পুরস্কার প্রভৃতি কিছুই থাকিত না। কর্ম্মে মনুষ্যের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আর এই কর্ম্মের মূলে তাহার ইচ্ছার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। ইচ্ছা দ্বারা কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা হয়। ইচ্ছাই শক্তি। এই শক্তি যাহার মধ্যে যত বেশী সে সেই পরিমাণে কৃতী। মানবের দেহ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, যন্ত্রস্বরূপ। মন যন্ত্রী হইয়া ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহাদিগকে যথাকর্ম্মে খাটাইতেছে। দেহের উপর ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য আশ্চর্য্যজনক। দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, স্থাণুবৎ নিস্পন্দ হইয়াছে, তথাপি মনের নির্দ্দেশে ইচ্ছাশক্তির প্রবর্ত্তনায় সে কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট। পৃথিবীর কর্ম্মবীরগণের

জীবনী আলোচনা করিলে এ কথার যাথার্থ্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাইবে।

পৃথিবীর সেই মহাপুরুষ সিদ্ধার্থের সাধনার কথা লইয়া আমরা এই কথা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। সিদ্ধার্থ আরাড় ও রুদ্রক নামক দুই প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট হিন্দুশাস্ত্র ও যোগশিক্ষা সমাপন করিলেন। তাঁহারা সিদ্ধার্থকে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে পারিলেন না। সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন, যে, দেহকে পাপ হইতে দূরে রাখিলাম তাহাতে কি ? দেহে ও মনে এখনও যে বাসনার বেদনা অনুভব করি—বাসনা নির্ম্মূল না করিলে হইল কি ? কৃচ্ছ্র সাধনে দেহমন ক্ষয় করিব—বাসনার বীজ দেহমন হইতে উৎপাটিত করিব তবে নিশ্চিন্ত হইব। এই সঙ্কল্প করিয়া সিদ্ধার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নিরঞ্জনার তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে ক্রমে উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটী শালবন আছে। সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। বনস্থলী শান্তিরসে পূর্ণ। নিরঞ্জনা সে রম্য বনস্থলীকে সতত স্নিগ্ধ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ছায়াপ্রধান বৃক্ষ সকল ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। উর্দ্ধে বৃক্ষশাখায় কলকণ্ঠ বিহগগণের কাকলী, নিম্নে হংস কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণের কলরব—নিরন্তর স্থানটীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতি মূর্ত্তিমতী শান্তি হইয়া সেখানে চির বিরাজ করিতেছেন। সিদ্ধার্থ পূর্ব্বে প্রমোদকাননে কত বিচরণ করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে এ শান্তি—এ তৃপ্তি পান নাই। এ স্থানে আসিয়া প্রাণ যেন শান্তিরসে আপ্লুত হইল। তিনি ইহাকে সাধনার উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া কৃত-সঙ্কল্প হইয়া সেই রম্য বনস্থলীর মধ্যে যোগাসনে বসিলেন। সিদ্ধার্থ ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে যোগ প্রক্রিয়া দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলেন—

যোগাসনে স্থিরতর হইয়া বসিলেন। এই যোগাসনে ক্রমাগত ছয় বৎসর অচল অটলভাবে কাটাইলেন। অন্তরে বাহিরে কত সংগ্রাম হইতে লাগিল। ক্ষুৎপিপাসা, স্নেহমমতা কিছুই তাঁহাকে কাতর করিতে পারিল না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তুষার মণ্ডিত উচ্চশৃঙ্গ গিরির ন্যায় তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে ধ্যানেমগ্ন। দেহের উপর দিয়া বৈশাখের রৌদ্র, শ্রাবণের ধারা, মাঘের হিম সকলই চলিয়া যাইতেছে। স্থিরপ্রতিজ্ঞ সাধকশ্রেষ্ঠের সে দিকে দৃষ্টি নাই। এই সুদীর্ঘ ষড়বর্ষ, সিদ্ধার্থ কোন দিন একটী বদরী, কোন দিন তিলতণ্ডুল ভোজন করিয়া, কোন দিন বা অনশনে অতিবাহিত করিয়াছেন। শাক্যকুলের গৌরব, কপিলবাস্তর শোভন, রাজকুমার সিদ্ধার্থের সে কমনীয় দেহ, আজ কঙ্কালসার হইয়াছে, স্থাণুবৎ নিস্পন্দ হইয়াছে, এখন জিজ্ঞাসা করি, মানব দেহের উপর ইচ্ছা-শক্তির প্রাধান্য কত? ইচ্ছা প্রবল হইলে, সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে, দেহপাত করিয়া, আত্মবলি দিয়া, যাহা সাধ্য, মানুষ তাহা করিতে পারে, এ বিষয়ে অতঃপর কে সন্দেহ করিবে?

ধর্ম্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার যোগতপ সাধনা করা অদ্যাপি এদেশে প্রচলিত আছে। যে মুক্তি লাভের জন্য সিদ্ধার্থ তাদৃশ উৎকট সাধনা করিয়াছিলেন, সেই মুক্তি কামনায় আজিও কত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি নিবিড় অরণ্যে নিভৃত গিরিগুহায় যোগনিরত রহিয়াছেন। ইহাঁদের এই সাধনায় এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, মানুষ উদ্দেশ্যসিদ্ধিলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে শারীরিক ক্লেশকে বাধা বলিয়া বিবেচনা করে না। দৈহিক অবসাদ, শারীরিক যন্ত্রণা কিছুই ইচ্ছাশক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে না। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী নিঃসৃত স্রোত যেমন সম্মুখস্থ শিলা সকলকে অতিক্রম করিয়া যায় সেইরূপ ইচ্ছাশক্তি

প্রবল বাধাকেও অতিক্রম করিতে পারে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ স্নেহ-মমতা, সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া যে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন তাহা এক প্রকারের সাধনা। সে সাধনা সাত্ত্বিক। আর এক প্রকারের সাধনার কথা বলিব। ইহা রাজসিক। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্রের উপাসক একজন সাধকপ্রবরের কাহিনী এখানে উল্লেখ করিব। তাহাতে বুঝিব, প্রণষ্টগৌরবও হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজকুমার বনবাসী হইয়া ফলমূল খাইয়া কি কঠোর সাধনা করিতে পারেন। এ সাধনার দৃশ্যভূমি রাজপুতানা। প্রকৃতির চণ্ডীমূর্ত্তির লীলাস্থল রাজপুতানার কোথাও বা সুদূরবিস্তৃত মরুভূমি, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিসমূহ, কোথাও বা তন্বী স্রোতস্বিনী, এই বিরলপ্রজ প্রদেশের শোভাসম্পাদন করিতেছে। এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে স্বাধীনতার পুণ্যভূমি—সতীধর্ম্মের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—চিতোর অবস্থিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও চিতোর মুসলমানের অধিকৃত। উদয়-সিংহ চিতোর হইতে বিতাড়িত হইয়া উদয়পুরে সামান্য রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু চারি বৎসর গত হইতে না হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। উদয়সিংহের মৃত্যুতে প্রতাপসিংহ মেওয়ারের রাণা হইলেন। মোগল সম্রাট তাঁহার পিতৃশত্রু। আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে অনেকে দিল্লীর সম্রাটের পক্ষ। কতকগুলি স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত ভিন্ন জগতে প্রতাপের অন্য কেহ নাই। সহায় সম্বল, বল ভরসা, যাহা কিছু বল—তাঁহারাই। ইঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতাপ মোগলরাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। এমন কি সখ্য স্থাপনেও ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। প্রতাপের ইচ্ছা তিনি চিতোর উদ্ধার করিবেন। নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি

সুদুস্তর মোগল সৈন্যসাগর পার হইবেন ইহাই তাঁহার ঐকান্তিকী বাসনা। ইহাই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি সতত তৎপর। শত্রুসৈন্যের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইতে লাগিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনাহারে, অনিদ্রায়, মেওয়ারের রাজপুতগণকে রণকুশল করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে প্রতাপসিংহ দ্বাবিংশ-সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এ দিকে লোক পরম্পরায় এ সম্বাদ আকবর সাহের কর্ণে পঁহুছিল। আকবর, মানসিংহ ও কুমার সেলিমকে অসংখ্য সৈন্যসহ প্রতাপসিংহকে দমন করিবার জন্য পাঠাইলেন। এই উপলক্ষে ভারতে থর্ম্মপলী—হল্‌দী-ঘাটের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের কথা ইতিহাসে পাঠ করিতে আজিও শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রতাপের সে সাহসের কথা, সে শৌর্য্যের কথা পাঠ করিলে এখনও সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হয়। এমনই প্রতাপের সে বীরত্ব। এই মহাহবে রাজপুত কুলকলঙ্ক মানসিংহের শোণিতে তাঁহার অসি রঞ্জিত করিবার মানসে প্রতাপ মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু মানসিংহকে না পাইয়া সম্মুখে সেলিমকে পাইলেন। অশ্ববর চৈতক সেলিমের রণহস্তীর শুণ্ডে পাদোত্তলন করিয়া দিল, প্রতা-পের বিষম বল্লম সেলিমের প্রতি ভীমবেগে প্রক্ষিপ্ত হইল। বল্লম লৌহ নির্ম্মিত হাওদায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে হস্তীচালকের প্রাণসংহার হইল। হস্তী নিরঙ্কুশ হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া নিজে ও প্রভুকে বাঁচাইল। আত্মহারা রণমদেমত্ত, প্রতাপ একবারে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত। বনবাসী হইলেও প্রতাপ মিবারের রাজছত্র ছাড়েন নাই। তখনও সে ভীষণ সমরাঙ্গনে সেই লোহিত রাজছত্র তাঁহার সেই গর্ব্বিত শিরোদেশে শোভা পাইতেছে। শত্রুসৈন্য সকলে ভীম-বেগে, ভৈরবনিনাদে সেই রাজছত্রের দিকে ধাবিত হইল। প্রতাপ

সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু তথাপি সে ছত্র ছাড়িবেন না। তিনি আসন্ন বিপদের গুরুত্ব বিলক্ষণ বুঝিলেন। কিন্তু সে বীর হৃদয় তাহাতে দমিত বা ত্রস্ত হইল না। প্রতাপ অপূর্ব্ব অসি চালন কৌশলে তখন শত্রু নিপাত করিতেছেন। তাঁহার সে বিশাল বরবপু শোণিত রঞ্জিত হইয়াছে। শত্রু হস্তে সপ্তস্থান হইতে ক্ষরধারে শোণিত স্রাব হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। অবিশ্রান্ত ও অক্লান্তভাবে অসীম উৎসাহের সহিত তিনি শত্রু সংহারে ব্যাপৃত—এমন সময় ঝলাধিপতি তাঁহার রাজছত্র স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া শত্রুসৈন্যগণকে প্রতারিত করিয়া প্রতাপকে রক্ষা করিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সেই নীল অশ্ব চৈতক প্রভুকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিল। এরূপ আত্মহারা হইয়া সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া যিনি স্বীয় সঙ্কল্প সাধন করেন ধন্য তিনি। ধন্য তাঁহার বীরমন্ত্রে দীক্ষা। পুণ্যভূমি হল্‌দীঘাটের সে ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। সে মহাহবে চতুর্দ্দশ সহস্র স্বদেশপ্রেমিক রাজভক্ত রাজপুতবীর জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সে গিরিসঙ্কটে আজিও তাঁহাদের বীরত্বের কথা প্রতিধ্বনি পথিককে বলিয়া দেয়। হলদীঘাটের যুদ্ধের পর, দিন, মাস, বর্ষ, গত হইতে লাগিল। প্রবল পরাক্রমশালী মোগলসম্রাট ক্রমে ক্রমে প্রতাপের অধিকৃত স্থান সকল একটী একটী করিয়া হস্তগত করিতে লাগিলেন। প্রতাপ একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিতাড়িত হইতে লাগিলেন। শত্রু ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে, তিনি পরিজনগণকে লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। মানুষ আত্মসুখের জন্য তত চিন্তিত নহে। কিসে পুত্র-কলত্রাদি পরিজনবর্গ সুখে থাকিবে সেইজন্য সতত সে চিন্তাকুল। পাছে মোগলের হস্তে পড়িয়া তাঁহার পরিজনবর্গের নিগ্রহ হয়, পবিত্র শিশোদীয় কুলে কলঙ্কস্পর্শ করে, সেই চিন্তাই তাঁহাকে সতত বেদনা

দিত। তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদের জন্য ব্যস্ত। সেই বনবাসে, ভীলগণের সাহচর্য্যে, তাঁহার এমন দিন গিয়াছে, যে, পুত্রকন্যাদিগকে খনির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে শত্রুভয়ে লুক্কায়িত রাখিতে হইয়াছে। বনজাত কন্দ ফলমূলে, নির্ঝরিণীর জলে, ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছে। কথিত আছে, একদিন তাঁহাদিগকে পাঁচবার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া পাঁচবার তাহা ত্যাগ করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। ইহাতেও সে বীর হৃদয় দমিত হয় নাই। ইহা কি কম কঠোর সাধনা? কেবল মোগল সম্রাটের সহিত সখ্য স্বীকার করিলে যিনি রাজোচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারিতেন, তিনি স্বেচ্ছায় স্বাধীনতার অনুরোধে, শুভ্র যশের জন্য, এ সন্ন্যাসব্রত স্বীকার করিয়াছেন, আর তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবেন, এই আশায় কঠোর সাধনায় নিযুক্ত। জিজ্ঞাসা করি, ইহার মূলে কি? উৎকট প্রতিজ্ঞা, দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি, ভিন্ন তাহা আর কি হইতে পারে!

অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। এই শক্তির সাহায্যে কেহ সাধুকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, কেহ বা অপকর্ম্ম করিতেছে। বৈজ্ঞানিক ইহার সাহায্যে বাষ্পাদি প্রস্তুত করিয়া কত কলকারখানা চালাইতেছেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ইহার সাহায্যে কত যজ্ঞকর্ম্ম করিতেছেন। আবার দুর্বৃত্ত দস্যু ইহার সাহায্যে কতশত অসহায় দুর্ব্বলের গৃহদাহ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ তাহার প্রয়োগের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। এখানে আমরা ইচ্ছাশক্তির আর একটী উদাহরণ দিব। ইহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা দেখিতে পাইব, কিন্তু প্রয়োগে সাধুতার অভাব দেখিব। ইহা তামসিক। আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি ভারতের ম্যাকিয়াভিলি —কূটরাজনীতি বিশারদ স্বনামখ্যাত চাণক্য।

মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে আজ শোকোৎসব। অদ্য মহারাজ মহানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধ। রাজবাটীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ তলে বিরাট শ্রাদ্ধসভা হইয়াছে। নানা দিগ্দেশ হইতে লোকজনের সমাগম হইতেছে। সভামধ্যে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণবর্গ একদিকে সমবেত হইয়াছেন। নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক হইতেছে। অপর দিকে পাত্রমিত্র সকলে সমবেত হইয়া শাস্ত্রালোচনা শুনিতেছেন। কোথাও উৎসর্গের নিমিত্ত সজ্জীকৃত অশ্বগজাদি শোভা পাইতেছে, কোথাও বা সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত তৈজসাদি সূর্য্য কিরণে প্রতিফলিত হইতেছে। সাধারণ দর্শকবর্গ সোৎসুক নয়নে চারিদিকে চাহিতেছে। বাহিরে ভট্টগণ তারস্বরে মৃতের গুণগান ও অক্ষয়স্বর্গের কামনা করিতেছে। সর্ব্বত্র কেমন একটা ঔৎসুক্য ও ব্যস্ততার ভাব লক্ষিত হইতেছে। ব্রাহ্মণকুলজাত প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসের উপর পাত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। তিনি তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছেন। কুটিল প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রু সর্ব্বদাই অশুভ সংসাধনের সুযোগ অন্বেষণে তৎপর। মহানন্দের অন্যতর মন্ত্রী শকটার ইতঃপূর্ব্বে মহানন্দের হস্তে নিগৃহীত ও অপমানিত হয়েন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার মানসে গোপনে গোপনে তিনি উদ্যোগ করিতেছিলেন। একদা তিনি চাণক্যকে একখানি সমগ্র ক্ষেত্রের কুশোত্তলনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া ও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, রাজনীতিজ্ঞান ও কূট-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মহানন্দের বংশের উচ্ছেদের উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিলেন এবং অধ্যাপকতার ব্যপদেশে রাজ্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করাইয়া দিলেন। এত দিনের পর শকটারের সুযোগ উপস্থিত। অদ্য তিনি চাণক্যকে পাত্রীয় ব্রাহ্মণরূপে আনাইয়া সভামধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া কার্য্য-ব্যপদেশে সভা হইতে প্রস্থান করেন। ইতিমধ্যে রাক্ষস মহানন্দের

আজ্ঞানুসারে পাত্রীয় ব্রাহ্মণকে সভামধ্যে আনিলেন। কিন্তু পাত্রীয় ব্রাহ্মণের আসন ইতঃপূর্ব্বে চাণক্য কর্ত্তৃক অধিকৃত দেখিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং চাণক্যের কৃষ্ণবর্ণ কদাকার ও আরক্তলোচন দেখিয়া বর্দ্ধিত বিস্ময়ে ও ক্রোধভরে, তাঁহাকে, কে সেই আসনে বসাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। চাণক্য সভামধ্যে এইরূপ ভাবে জিজ্ঞাসিত হওয়াতে কিছু বিরক্ত ও অপমানিত হইলেন। কিন্তু তিনি মনোভাব লুক্কায়িত রাখিয়া রাক্ষসের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। রাক্ষস শকটারের সকল কথাই অবগত ছিলেন। তাঁহার এই চাতুরীর কথা রাজসকাশে গিয়া প্রকাশ করিলেন। রাজা পূর্ব্বাবধি শকটারের উপর বিরক্ত ছিলেন। অদ্য শ্রাদ্ধসভায় তাঁহার এইরূপ কার্য্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দ্রুতবেগে সভামধ্যে আসিয়া কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাবদন্ত, রক্তচক্ষু, চাণক্যের শিখাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আসনচ্যুত করিলেন। এই ব্যাপারে চাণক্য শকটারের দুরভিসন্ধির কথা কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি সভামধ্যে এতাদৃশভাবে অপমানিত হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সভাস্থলে সজোরে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, রে রাজকুলকলঙ্ক দুর্ম্মতি মহানন্দ, তুই সভামধ্যে নিরপরাধ ব্রাহ্মণের যে অপমান করিলি, ইহার জন্য একদিন তোকে সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অতঃপর চাণক্য সভাজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "অহে সভ্যগণ, আমি চাণক্য শর্ম্মা; মহানন্দ নিরপরাধে অদ্য আমার শিখাকর্ষণ করিয়া যে অপমান করিল ইহার প্রতিফল আমি ইহাকে দিব। আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি যতদিন নন্দবংশের ধ্বংস করিতে না পারিব ততদিন আমার এই মুক্ত শিখা বন্ধন করিব না। এই মুক্ত শিখা ইহার কাল ভুজঙ্গস্বরূপ হইবে।" এই বলিয়া চাণক্য সভাস্থল ত্যাগ করিয়া একবারে শকটারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সভাজন সকলে বিরাট

শ্রাদ্ধসভায় দক্ষযজ্ঞের অভিনয় দেখিলেন। নিমন্ত্রিত বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিগৃহীত হইতে দেখিয়া, যদিও রাজভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু সভাজন লজ্জায় ও ঘৃণায় অবনত মুখে রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "অপরংবা কিংভবিষ্যতি।"

শকটার ব্রাহ্মণের তথাবিধ মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিলেন, যে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। অতঃপর মহানন্দের সর্ব্বনাশের আয়োজন করা যাউক, মনে মনে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া বিষয়ী লোকের ন্যায় মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া শকটার চাণক্যকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কুটিলে কুটিলে একই উদ্দেশ্যে মিলন হইল। চাণক্য কূট-রাজনীতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অধিকন্তু তিনি রসায়নাদি নানা দ্রব্যবিজ্ঞানও জানিতেন। তাঁহার এই সকল বিদ্যাবুদ্ধি এক্ষণে মহানন্দের ধ্বংসের জন্য প্রযুক্ত হইল। কৌশলে বিষপ্রয়োগে মহানন্দ নিহত হয়েন। তৎপরে যেরূপে মহানন্দের ভ্রাতা এবং চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ বিনষ্ট হন, যেরূপে চন্দ্রগুপ্ত রাজাসন প্রাপ্ত হন, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত ইতিহাসে আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে। এখানে সে সকল কথার অবতারণার প্রয়োজন নাই। যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে মানুষ ইচ্ছা করিলে, অতি দুরূহ ব্যাপারও সম্পাদন করিতে পারে। কুটিল মানবপ্রকৃতিতে প্রতিজ্ঞার বল কি ভয়ঙ্কর! কোথায় দরিদ্র চাণক্য পণ্ডিত আর কোথায় রাজরাজেশ্বর মগধাধিপতি মহারাজ মহানন্দ! কালবশে চাণক্যের উৎকট প্রতিজ্ঞার সমক্ষে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় তিনি ভাসিয়া গেলেন, এমনই ইচ্ছাশক্তির গুণ! যদিও চাণক্যের এই রাজ্যোচ্ছেদ কার্য্য কোনমতে প্রশংসার্হ নহে, তথাপি ইহা মানবের ইচ্ছাশক্তির একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া এখানে ইহার উল্লেখ করা গেল। চাণক্যের এ কার্য্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিহিংসাসম্ভূত

বলিয়া ইহাকে তামসিক কর্ম্মের অন্তর্গত করা যায়। তামসিক কর্ম্ম কখন অনুকরণ যোগ্য নহে। অধিকন্তু বিশেষরূপে নিন্দার্হ। চাণক্যের এই সকল কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া কে বিশ্বাস করিবে, যে মানুষ অবস্থার দাস, ঘটনাচক্রে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়? মানুষ যদি জানে ও বুঝে ও বিশ্বাস করে, যে তাহার মধ্যে শক্তি আছে, তবে সে কেন শবের মত থাকিবে? আপনার গতি সে আপনি ঠিক করিয়া লইবে। গম্যস্থানে যাইবার পথে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে, কোন বাধাই সে গতিকে রুদ্ধ করিতে পারে না। যদি কখন বিঘ্নের শক্তি আত্মশক্তি হইতে প্রবলতর হয়, তবে, সে, বিঘ্ন বিনাশ করিবার চেষ্টায় সেখানে দেহপাত করিবে, তথাপি অবসাদগ্রস্ত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পশ্চাৎপদ হইবে না। এই প্রকার চেষ্টাতেই বীরত্ব—এইখানেই দুর্ব্বল ও প্রবলের পার্থক্য।

বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সহাস্যবদনে দেহভস্ম করার দৃষ্টান্ত পুণ্যভূমি ভারতে বিরল নহে। সতীধর্ম্মের অনুরোধে, পরলোকে স্বামিসহ চিরমিলনের আশায়, ঐহিক সুখ, ঐশ্বর্য্য, স্নেহমমতা, সকলই ত্যাগ করিয়া মৃত পতির চিতাপার্শ্বে শয়ন করিয়া ভারতললনা জগতকে দেখাইয়াছেন, যে, তিনি কুসুম হইতে কোমল হইলেও সময়ে কুলিশ হইতেও কঠোর হইতে পারেন। সূর্য্যালোকের স্পর্শ ভয়ে যিনি অবগুণ্ঠনবতী, তিনি আবার জ্বলন্ত চিতায় পতি পার্শ্বে শোভা পান। এমন দৃশ্য, ভারত ভিন্ন আর কোথায় কে দেখিয়াছে?

রাজপুতানার ইতিহাস হইতে একটী ঘটনার উল্লেখ এখানে করিতেছি।

১৭৮০ সম্বৎ। আষাঢ় মাস। অমাবস্যা। প্রাবৃটের ঘনঘটা চারিদিক ঘেরিয়া আছে। প্রকৃতি যেন পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াই শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে। ধীরে ধীরে অজিতসিংহের মৃতদেহ লইয়া তরণী

তীরে লাগিল। তীরে চিতাসজ্জিত হইয়াছে। রাজোচিত আয়োজন। ভারে ভারে ঘৃত চন্দন আসিতেছে। ধূপধূনা প্রভৃতি রাশীকৃত করা হইয়াছে। পুণ্যতোয়া নদী সকলের জল কুম্ভে কুম্ভে সজ্জিত। চারি দিকে কেমন একটা বিষাদমাখা ব্যস্ততা দৃষ্ট হইতেছে। রাজকর্ম্মচারী চিরন্তন প্রথা অনুসারে রাজান্তঃপুরে শোক-সম্বাদ দিলেন। শ্রবণমাত্র রাজমহিষীগণ বাহিরে আসিলেন। এবং সকলে অজিতের অনুগমন করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা ভক্তিগদ্গদ স্বরে, বিষ্ণুর কৃপাভিক্ষা করিলেন—বলিলেন, প্রভো, দেখিও যেন সতীধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি। অতঃপর তাঁহারা সজ্জিত হইয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা বীরের দুহিতা, বীরের বনিতা, বীরের মাতা, তাঁহারা কি কখন মৃত্যুকে ভয় করেন? স্বচ্ছন্দচিত্তে, সোৎসাহে, আজ সকলে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা নানা রত্নাভরণে বিভূষিতা হইয়াছেন। গন্ধমাল্য সংযোগে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছেন। অমঙ্গলের দিনে মঙ্গলাচরণ। সকলকে একত্র সমবেত দেখিয়া, নাজির নাথু কৃতাঞ্জলি-পুটে শোকগদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, পূজনীয়া জননীগণ, আপনারা যে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন, তাহার পূর্ব্বে একবার বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনারা এতাবৎ কাল সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াছেন। সূর্য্যকিরণ স্পর্শেও ক্লেশ বোধ করিয়াছেন। এখন কেমন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় দেহ ভস্ম করিবেন? এখন মনের যে ভাব আছে, প্রকৃতপক্ষে, যখন চিতারোহণ করিবেন, অগ্নির উত্তাপ যখন দেহে লাগিবে, তখন যে, সে ভাব থাকিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? তখন যদি পশ্চাৎপদ হয়েন তবে নিন্দা রাখিবার আর স্থান থাকিবে না। অধিকন্তু আপনাদের স্বর্গীয় স্বামীর অমলযশে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। এই সকল বিষয় স্থিরচিত্তে পুনরায় বিবেচনা করুন।

নাজির নাথু নীরব হইলেন। তখন মহিষীগণ কোমল অথচ প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, যে সতীর সুখ, ঐশ্বর্য্য, যাহা কিছু বল, সকলই পতিগত। পতিপ্রাণা সতী পতিদেহান্তে পতির অনুগমন ভিন্ন অন্য কোন কামনা করে না। ইহাই আমাদের সনাতন কুলধর্ম্ম; তুমি ইহা বিশেষরূপে অবগত আছ। আমরা দৈহিক ক্লেশে কাতর হইব না। নাজিরের যুক্তি ব্যর্থ হইল। অতঃপর মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতি সকলে বিনীতভাবে অজিত সিংহের প্রধান মহিষী চৌহানীর সমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, দেবি, জননি, এ শোকের উচ্ছ্বাস আর বাড়াইবেন না। আপনার সহগমন সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। মহারাজের লোকান্তর গমনে আমরা পিতৃহীন হইয়াছি। এখন যদি আপনি তাঁহার অনুগমন করেন তবে আমরা মাতৃহীনও হইব। সমগ্র রাজ্য শোকসাগরে নিমগ্ন হইবে। জানিনা সে শোকোচ্ছ্বাস কত কালে প্রশমিত হইবে। রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। প্রজাসাধারণের কুশলের জন্য, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আপনি ও সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। শাস্ত্রে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা আছে। আপনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পতির অক্ষয় স্বর্গ কামনায় রত থাকুন। তাহাতে সকলের মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সকলে নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ সকলে নীরব নিস্পন্দভাবে রহিলেন। তাহার পর চৌহান মহিষী সকলকে সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। এবং এরূপ নির্ব্বন্ধসহকারে পতির অনুগমনের ঐকান্তিক বাসনা জ্ঞাপন করিলেন যে, তাহার পর কেহ দ্বিরুক্তি করিলেন না। অনন্তর তাঁহারা সকলে চিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে পতিপদ প্রান্তে অবলুণ্ঠিতা হইলেন। সে পদারবিন্দ পূজা করিলেন। ইহার পর যথারীতি চিতা প্রদক্ষিণ

করিলেন। চিতা প্রদক্ষিণ কালে মহিষীগণ আপন আপন রত্নাভরণ উন্মোচন করিয়া দান করিতে লাগিলেন। এ শোকের কথা আর বাড়াইয়া কাজ নাই। ক্রমে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানাদির পর অজিতের দ্বাদশ-মহিষী তাঁহাদের পতির চিতায় শায়িতা হইলেন। চিতায় অগ্নি সংযোগ হইল। দেখিতে দেখিতে সে বিপুল চিতা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। পতিদেবতা মহিষীগণ প্রফুল্লবদনে সেই অগ্নিকুণ্ডে স্ব স্ব কুসুমসুকুমার দেহ আহুতি দিলেন। বোধ হইল যেন সতীধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বকীয় স্নেহময় স্নিগ্ধ ক্রোড়ে তাঁহাদিগকে স্থান দিলেন। অন্যথা তাঁহাদের সে প্রফুল্লতা, সে বিভা, সে জ্যোতিঃ, কোথা হইতে আসিল? মহিষীগণের কমনীয় দেহের রূপলাবণ্য হরণ করিয়া অগ্নির যেন অধিকতর দীপ্তি হইল। বীরাঙ্গনাগণের এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া, সমবেত সকলে ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ে প্রশংসার গীতিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল। পুরুষ পরম্পরায় সে প্রশংসার প্রতিধ্বনি আজিও শুনিতেছে এবং কালের দূরতম ভবিষ্যতেও তাহা শুনিবে।

একে একে সিদ্ধার্থ, প্রতাপ, চাণক্য ও দ্বাদশ-মহিষীর কথা বলা হইল। ইহাঁদের প্রত্যেকের কার্য্যের মূলে আমরা কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাই; আর সেই বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন দৃঢ়-সঙ্কল্প দেখিতে পাই। সঙ্কল্প সাধনার জন্য ইহাঁরা জগতে বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালার আলোচনা করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যে মানুষ যদি কোন বিষয় বিচার করিয়া, "করিব" বলিয়া স্থির করে, তবে তাহা সম্পন্ন করিতে দেহপাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মানুষের একটী অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। সেটী তাহার ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তির কার্য্যকারিত্বে আমরা যত আস্থাবান হইব, আমাদের চেষ্টাশক্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

এই ইচ্ছাশক্তি কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য সিদ্ধার্থের যোগসাধনা, প্রতাপসিংহের স্বদেশ উদ্ধারের প্রয়াস, চাণক্যের নন্দবংশ ধ্বংসকরণ আর অজিত সিংহের দ্বাদশ মহিষীর সহমরণে অক্ষয় স্বর্গলাভ ইতি বিশ্বাসের জন্য, চিতারোহণের কথা, এখানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাঁদের প্রত্যেকের ইচ্ছাশক্তি এতদূর প্রবল ছিল, যে ইহাঁদের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে কোন বাধাবিপত্তি দাঁড়াইতে পারে নাই। গিরিনিঃসৃতা সাগর-গামিনী নদীর প্রবল স্রোতের গতি যেমন কেহ রোধ করিতে পারে না, তেমনই এই সকল অচল অটল কৃতপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছার সম্মুখে স্নেহ মমতা, সুখ ঐশ্বর্য্য, দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক, শারীরিক নির্য্যাতন কিছুই দাঁড়াইতে পারে নাই। সুখের মোহিনীমূর্ত্তি বা দুঃখের ভৈরবভ্রূকুটী কিছুই ইচ্ছাশক্তির গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। অভীষ্টবস্তু লাভের জন্য, কামনাপূর্ণ করিবার জন্য, মানুষ আপন দেহমনের উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে। সিদ্ধিলাভ আর দেহমনের পতন, এই দুই সীমার মধ্যে ইহা কার্য্য করে। এই দুই সীমার মধ্যে কোন স্থানে এ শক্তির বিরাম নাই। এমনই উৎকট এ শক্তি। সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর মানবের অন্তরে এই মহাশক্তি দিয়াছেন। আমরা এ শক্তিমাহাত্ম্য বুঝি না। অধিক কি, আমরা অনেকে ইহার অস্তিত্বের কথা পর্য্যন্ত জানি না। এই শক্তির বিষয় জানা আবশ্যক। এই শক্তির পরিচয় পাওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য প্রথমেই শক্তিপরিচয়ের কথা বলা গেল।

সঙ্কল্প।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেশে সঙ্কল্পের কথা বলিবার সময় সংযমের কথা মনে আসে। লোকে সামান্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে সংযম করিয়া থাকে। পূর্ব্ব দিন এক সন্ধ্যা নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। ব্রতের পূর্ব্বে স্বৈরাচার করিলে, অসংযত থাকিলে, ব্রত পণ্ড হইবে—লোকে এই ভয় করে। কায়মনোবাক্যে লোকে শুদ্ধ, সংযত হইয়া ব্রতের সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রত ও কর্ত্তব্য সমান। দেবকার্য্যের অনুষ্ঠানপ্রয়াসী ব্যক্তির যেমন শুদ্ধ এবং সংযত হওয়া আবশ্যক কর্ত্তব্যপালনপ্রয়াসী জনেরও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সংযত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কীর্ত্তি-মন্দিরে যিনি কর্ত্তব্য পালনের জন্য সঙ্কল্প করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অগ্রে কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ ও সংযত হইতে হইবে। আত্মসংযমে শক্তি সঞ্চয় হয়। "সংযমীবলী"। "কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং" এইরূপ লোকই জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। সংযমী ব্যক্তিকে আধুনিক ভাষায় চরিত্রবান ব্যক্তি বলে।

চরিত্রবান ব্যক্তিগণের সঙ্কল্প সাধু হইয়া থাকে। আর যাঁহার সঙ্কল্প সাধু, ঈশ্বর তাঁহার সহায়। পুরুষকার ও দৈবের মিলন হইলে, সঙ্কল্প দৃঢ় হয়, সাধনা সহজ হয়, সিদ্ধি নিকটতর হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, চরিত্রবান হইলে অভীষ্ট ফল লাভের সুবিধা হইয়া থাকে। অন্যথা অসংযত হইলে, দুশ্চরিত্র হইলে, অন্তরে রিপু সকল প্রবল হয়, বাহিরে বিঘ্ন বৃদ্ধি হয়। অতএব জানিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্যের পথে বিঘ্ন

বৃদ্ধি করা উচিত নহে। যদি কোন কর্ম্মেচ্ছু যুবক, এই কীর্ত্তি-মন্দিরে, এই প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে, এই সাধনভূমিতে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন, কর্ম্মে কৃতী হইতে চাহেন, তবে, কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্কল্পের পূর্ব্বেই তাঁহাকে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। সংযমে তিনি বল পাইবেন, সে শক্তি তাঁহার সাধনার সাহায্য করিবে।

বাসনা ও সঙ্কল্পে বিস্তর প্রভেদ। বাসনা অলস ব্যক্তির কল্পনা মাত্র। উহা প্রায়ই আকাশকুসুমে পরিণত হয়। কিন্তু সঙ্কল্প সেরূপ নহে। যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্য অবধারণের পর, ও তৎসাধনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, মনের যে প্রতিজ্ঞার ভাব, তাহাকে সঙ্কল্প বলা যাইতে পারে। বাসনা প্রায়ই যুক্তির বশে যাইতে চাহে না। উহা জাগ্রদবস্থার স্বপ্নস্বরূপ। মানুষ চতুষ্কোণ গোলক লইয়া খেলা করিবার বাসনা করিতে পারে—কিন্তু তাহা পাইবার জন্য সঙ্কল্প করিতে পারে না। লোকে ইক্ষুর ফলে রসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বাসনা করিতে পারে—কিন্তু তাহা পাইবার জন্য সঙ্কল্প করিতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য প্রথমে স্থির করিবেন, তাহার পর বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার সাধনের জন্য সঙ্কল্প করিবেন। সংযতচিত্ত হইয়া ভগবৎসমীপে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যসাধনের জন্য সঙ্কল্প করিতে হইবে। এক সময়ে একটীর অধিক বিষয়ের জন্য সঙ্কল্প করা উচিত নহে। এইরূপে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কীর্ত্তি-মন্দিরে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহার পর "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

ব্রতাচারের পূর্ব্বে যেমন সংযমের ব্যবস্থা আছে, ব্রতাচারের মধ্যে তেমনই 'কথা' শুনার বিধি আছে। দেহমনকে অবসাদ হইতে দূরে

রাখা আবশ্যক। সেই জন্য যিনি যে মন্ত্রের সাধক, তাঁহার সেই মন্ত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণের কথা শুনা উচিত। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণ কিজন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সাধনার সময়ে কত বিঘ্ন পাইয়াছিলেন, কত বিভীষিকা দর্শন করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে সে সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, কত আয়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বিবরণ তাঁহাদিগের পুণ্যকাহিনীতে শুনা যায়। দুর্ভাগ্য ব্যাধ কিরূপে মহাদেব-কে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ভাগ্যলাভ করিয়াছিল, শূদ্র সুঁষেণ কি উপায়ে কেশব-মন্দিরে উপবাসী থাকিয়া মৃত্যুর পরে যমযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং বহুকাল স্বর্গবাস করেন, আর তাহার পর জন্মান্তরে চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি উপায়ে প্রজাহিতার্থে চিত্রাঙ্গদ নামে গোবিন্দের ভজনা প্রচার করিয়াছিলেন, নিষ্ঠাবান ব্রতাচারী হিন্দু এখনও তৎসমুদায় পুণ্যকথা শুনিয়া উপবাসাদির ক্লেশ লাঘব করিয়া আশান্বিত হৃদয়ে কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন।

এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনের বহুবিধ কঠোর কর্ত্তব্যরূপ ব্রতাচরণের সময় আমাদিগের পূর্ব্বোক্তরূপে 'কথা' শুনা আবশ্যক। মহাপুরুষগণের জীবনের পুণ্যকাহিনী শ্রবণে আমরা মনপ্রাণকে অবসাদ হইতে রক্ষা করিতে পারিব। সময় সৈকতে মহাজনগণের পদাঙ্ক দৃষ্টে আমরাও কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

পৌরাণিক পুরুষগণের জীবন এক্ষণে আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে অসমর্থ। তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ। কিন্তু তথাপি সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, যে বর্ত্তমান যুগে ইংরাজের শাসিত ভারতে এমন অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন আমাদের আদর্শ-স্থানীয় হইতে পারে। আমরা এই গ্রন্থে তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েক জনের জীবনের সঙ্কল্প, সাধনা ও সিদ্ধির কথা আলোচনা করিব—দেখিতে

পাইব, যে, আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্কের অনুগমন করিলে মানবজীবনের মহোদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সংসাধিত করিতে পারিব।

যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ রামমোহন, প্রজারঞ্জকবহুবিদ্যাবিদ্ ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি মহারাজ রামবর্ম্ম, সুমন্ত্রী রাজস্ব তত্ত্বজ্ঞ স্যর মাধবরাও ও স্যর সলর জঙ্গ, দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর, শিক্ষা-সংস্কারক স্যর সৈয়দ আহম্মদ, বৃহস্পতিকল্প তারানাথ বাচস্পতি, স্বনামধন্য শ্যামাচরণ, সুবিখ্যাত স্যর মথুস্বামী আর্য্য, অলৌকিক প্রতিভাশালী মধুসূদন, সাহিত্যসেবক অক্ষয়কুমার, ধনকুবের স্যর জেমসেটজী ও রামদুলালের জীবনে অনেকেই আপন আপন জীবনের আদর্শ পাইবেন। ধনীর সন্তান কিরূপে বহুবিধ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া বিদ্বান ও স্বদেশ প্রেমিক হইতে পারেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান কি প্রকারে অনুকূল অবস্থায় পতিত হইলে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিবলে বিশাল রাজ্যের সংস্কারক ও সুব্যবস্থাপক হইতে পারেন, নিঃস্ব দরিদ্র সন্তান কিরূপে বহু বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া আজীবন বিদ্যাচর্চ্চা করিতে সক্ষম হয়েন ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন; এ সকল কথা ইহাদের জীবনবৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায়। যিনি সাহিত্যসেবা করিয়া মাতৃ-ভাষার পুষ্টিসাধন করিতে চাহেন, ভাষায় নূতন ভাব আনিতে চাহেন, তিনিও ইহাদের মধ্যে স্বীয় মনোমত আদর্শ পুরুষ পাইবেন। দাসত্ববিমুক্ত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে কি প্রকারে ধনসঞ্চয় করিতে হয়, ইহা যিনি জানিতে চাহেন, তিনিও স্বকীয় আদর্শপুরুষের চরিত্র ইঁহাদের মধ্যেই পাইবেন।

শক্তি নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জলের ন্যায় স্বাদবিহীন। দেশভেদে সে জলস্রোতে কোথাও মিষ্টরস কোথাও বা লবণ সংযুক্ত হয়। সেইরূপ মানুষের শক্তি সঙ্কল্প ভেদে কোথাও হিতকর কোথাও বা অহিতকর হয়। চরিত্রবলের ন্যায় অর্থেরও প্রভূত বল আছে। মানুষ অর্থবলে

বলীয়ান হইয়া সংসারে কত কি করিতেছে। যেখানে চরিত্রবল ও অর্থবল একত্র সংযুক্ত হয়, আর যদি সেই পবিত্র সঙ্গমে সাধুসঙ্কল্প আসিয়া মিলে, তবে সে দৃশ্য কত সুন্দর হয়! সেই পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমের ধারা যে যে দেশ দিয়া যায়, তাহা পূত হয় আর সেই ত্রিবেণী সঙ্গমের সংস্পর্শে যাঁহারা আসেন তাঁহারাও ধন্য হন। রাজা রামমোহন রায় এবং মহারাজ রামবর্ম্মের চরিত্রে এই ত্রিবেণী সঙ্গম দেখিতে পাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান ভারতের নবযুগের সূচনা। ইংরাজাধিকৃত ভারতের তিনি প্রভাতরবি। সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই পূতচরিত্রের আলোচনা করা যাউক।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখে লালিতপালিত হইয়াও মনুষ্য জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, রাজার প্রতি, তাঁহার যে কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি ভুলেন নাই। এবং সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ফলবতী হইতে দেখিতে পান নাই। পৃথিবীর অতি অল্প মহাপুরুষগণ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সৎকর্ম্মের ফলাফল দেখিয়া যাইতে পান। যাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল ও বিস্তৃত, যাঁহাদের হিতেচ্ছা সর্ব্বজীবে, তাঁহাদের চেষ্টার ফল তাঁহারা সকলে দেখিতে পান না; কিন্তু মানসচক্ষের দূর-দৃষ্টিতে তাঁহারা তাহা দেখিতে পান। এবং সেই জন্যই তাঁহারা দেহপাত করিয়া সে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই সকল মহাপ্রাণগণ দেশকালের অতীত হইয়া জীবিত থাকেন। আমাদের দেশের গৌরবস্থল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই শ্রেণীর মহাপ্রাণ ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন বাঙ্গালার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কি রাজনীতিক, কি সামাজিক, কি শিক্ষাবিষয়ক কোন

অবস্থাই ভাল ছিল না। দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে বিশৃঙ্খলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইত। একদিকে মুসলমান রাজত্বের অবসান—অপর দিকে ইংরাজ রাজত্বের ক্রমোদয়—এই রাজশক্তিদ্বয়ের সন্ধ্যাসময়ে সকলই বিকৃত ভাবাপন্ন বোধ হইত। ভারতের ভাগ্যাকাশে একদিকে মুসলমান রাজত্বের তমোময়ী নিশার শেষ হইয়া আসিতেছে, অপর দিকে ইংরাজের নবরাজশক্তি প্রভাময় মহাদ্যুতি বালারুণের ন্যায় অরুণিমা বিকীর্ণ করিয়া পূর্ব্বাকাশে বঙ্গভূমিতে উদিত হইতেছে। রাজশক্তির এই সন্ধিসময়ে বঙ্গদেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব।

এই সময়ে দেশে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, ও সহমরণ প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত। সাধারণের শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বা মিঞাজির মকতবে অথবা পণ্ডিতের টোলে শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। অধিকাংশ বালকের বিদ্যাশিক্ষা পাঠশালা বা মকতবে আরম্ভও শেষ হইত। উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছা থাকিলেও নানা প্রকার অসুবিধার জন্য তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। তবে যাঁহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিত ও পারিবারিক সঙ্গতি তাদৃশ থাকিত, তাঁহাদের পক্ষে উহা কতক পরিমাণে সম্ভবপর হইত। রামমোহন রায় এইরূপ সামাজিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া প্রথমে কিছুদিন গুরুমহাশয় ও মিঞাজীর নিকট পড়েন। উত্তরকালে রাজদ্বারে পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইবেন এই আশায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে ১২ বৎসর বয়সে পাটনায় আরবী ও পারসী শিক্ষার্থে পাঠাইয়া দেন। তখন আরবী ও পারসী শিক্ষার জন্য পাটনা প্রসিদ্ধ ছিল। বালক রামমোহন অল্প সময়ের মধ্যে এই দুই ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশী গমন করেন। আরবী ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠান্তে তাঁহার ধর্ম্মমত

পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইলেন এবং তৎপ্রচারের জন্য যত্নশীল হইলেন। প্রচলিত সহমরণ প্রথা রহিত করিবার জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হন। দেশে যাহাতে পাশ্চাত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞান প্রচলিত হয়, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা অচল অটল। তাঁহার সঙ্কল্প সাধু। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান প্রত্যেক উন্নতির মূলে আমরা রাজার সাধু সঙ্কল্পের চিহ্ন দেখিতে পাই। যখন আমরা তাঁহার উৎকট সাধনার কথা আলোচনা করিব তখন আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব, যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা, তাঁহার সঙ্কল্প কিরূপ স্থির ও দৃঢ় ছিল। সচ্ছল অবস্থা, অন্যান্য ভোগ সুখের প্রলোভন, অথবা সামাজিক উৎপীড়ন, কিছুই যে সদিচ্ছাসম্পন্ন যুবকের সঙ্কল্পের পথে অন্তরায় হইতে পারে না, একথা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে বেশ বুঝা যায়।

ভগবান যাঁহাদিগকে ধনজন দিয়াছেন, সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যাঁহারা লালিত পালিত, বিষয় বিভবে যাঁহারা সতত উৎফুল্ল, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে জ্ঞানী ও জনহিতৈষী বলিয়া কীর্ত্তি-মন্দিরে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্যপথে যাইতে বিশিষ্ট শক্তির আবশ্যক। আবার সুখৈশ্বর্য্যের মোহাবরণ ভেদ করিয়া, লক্ষ্য স্থির করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতেও সেই প্রকার শক্তির আবশ্যক। অনশনে বা অর্দ্ধাশনে, নগ্নদেহে বা চীরপরিধানে, শীতের হিমে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে, বর্ষার ধারায় ক্লিষ্ট হইয়া নিজের গন্তব্য স্থানে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। দরিদ্রজনের সাধুসঙ্কল্প ও তৎসাধনের এরূপ অনেক অন্তরায় আছে। কিন্তু ধনীর সাধুসঙ্কল্পের সাধনার অন্তরায়ও অল্প নহে। তিনি সতত এমনভাবে এমন সহচরগণের দ্বারা পরিবৃত থাকেন, যে তাঁহার হৃদয়ে সদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর থাকে না। বাল্যে অতি স্নেহশীল

জনকজননী তাঁহাকে কোন প্রকার ক্লেশের কাছে যাইতে দেন না। পাছে কোন কষ্ট হয়—এই ভয়ে তাঁহারা সতত চিন্তাকুল। সুতরাং পরিশ্রম করিয়া পাঠাভ্যাস করা, নিজে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্যের ক্লেশ মোচন করা, হয় ত তাঁহারা পছন্দ করেন না। অন্যের দুঃখ দেখিয়া পাছে, অঞ্চলের নিধি, নয়নের মণি, স্নেহের গোপালের হৃদয়ে দুঃখ হয়, এজন্য তাঁহাদের আনন্দভবনে দীনদুঃখী, রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেন না। এরূপ পরিবারের সন্তানের হৃদয়ে সদিচ্ছার উদয়ের সম্ভবনা কম। আর যদি সদিচ্ছা হয়, তবে তাহা পূর্ণ করিবার অন্তরায়ও অনেক। যৌবনে ধনীর পুত্র বিষয়সুখে নিয়ত প্রমত্ত থাকেন, তিনি দুর্দ্দম রিপুসেবায় সুখী হয়েন, ইহা তাঁহার চাটুকার ও পরিচারকবর্গের আন্তরিক কামনা ও প্রয়াস। এরূপ স্থলে যৌবনের শক্তি, উৎসাহ, উদ্যম, যে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পরহিতে নিযুক্ত হইবে, তাহার সম্ভবনা কোথায়? সদ্বিবেচক না হইলে, সদিচ্ছা না থাকিলে, সাধুসঙ্কল্প না করিলে, সাধনার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্য উভয়ই অন্তরায় হয়। দারিদ্র্যে অবসাদ আনয়ন করে, ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ততা উৎপাদন করে। যখন দারিদ্র্য বা ঐশ্বর্য্য কর্ত্তব্যের পথে বাধা দেয়, তখন দুটীকেই অন্তরায় বলিতে হইবে। আর অন্তরায় অতিক্রম করিতে ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই চরিত্রের বলের আবশ্যক। সঙ্কল্প দৃঢ় হওয়া চাই, অন্যথা সকলই ব্যর্থ হইবে।

জগতের কীর্ত্তি-মন্দিরে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মোহাবরণ ভেদ করিয়া, বিষয়-বিভবে মুগ্ধ না হইয়া, কত মহাত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনা করিয়াছেন। এরূপ মহাত্মাগণের কীর্ত্তিকথা জগতের কীর্ত্তিভবনে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক বিত্তশালী সদিচ্ছা-সম্পন্ন সৎকর্ম্মেচ্ছু যুবক কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন।

পুণ্যভূমি ভারতে রাজর্ষিগণের কথা কে না জানেন? জ্ঞানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ইঁহারা কতই না করিয়াছেন? জ্ঞানের জন্য, সত্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের নিমিত্ত, প্রজাহিতার্থে ইঁহারা কত কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া গিয়াছেন। চারিদিকে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি, সুখের উজ্জ্বল চিত্র! ভোগসুখের কামনাকে তুচ্ছ করিয়া ইঁহারা আপনাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন, দৃঢ় পাদবিক্ষেপে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনকের কথা কাহার অবিদিত? রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই ত্রিদিবত্রাস তপস্যার কথা শুনিলে এখনও দেহে রোমাঞ্চ হয়, ভয়ে ও ভক্তিতে চিত্ত স্তম্ভিত হয়। আমাদের দেশে এরূপ পুরাণকাহিনী অনেক আছে। এখানে সে সব কথা বাহুল্যভয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হইল না। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় যে বর্ত্তমান যুগেও আদর্শ রাজ-চরিত্রের তাদৃশ অভাব নাই। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ রামবর্ম্মের চরিত্র ইহার একটী অন্যতম।* মহারাজ রামবর্ম্মের স্বাস্থ্য বাল্যকাল হইতেই ভাল ছিল না। কিন্তু তাহাতে কি? তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অদম্য ছিল। তিনি রুগ্ন ও ক্ষীণকায় ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার পাঠানুরাগ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং প্রজার হিত সাধন কখনও কমে নাই। অধিকন্তু ঐ সকল তাঁহার জীবনে বয়সের সহিত উত্তরোত্তর

* ১৮৩৭ খৃঃ অঃ ১৯এ মে মহারাজ রামবর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মালয় ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৪৯ খৃঃ অঃ স্বনামপ্রসিদ্ধ স্যর টি, মাধবরাও মহারাজের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খৃঃ অঃ মহারাজের পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৫৯ খৃঃ অঃ ২২ বৎসরে মহারাজ বিবাহ করেন। ১৮৬১ খৃঃ অঃ মহারাজ মান্দ্রাজ নগরে পরিভ্রমণে আসেন। মান্দ্রাজে তৎকালীন গভর্ণর স্যর উইলিয়াম ডেনিসন ইহাঁর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন He is by far the most intelligent native I have seen. মহারাজ বহুবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান

বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া স্বীয় রাজ্যের সুশাসন করিবেন, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, এবং এই জন্য বাল্য হইতেই সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন।.

মন্ত্রণাকুশল স্যর মাধবরাও ও স্যর সলরজঙ্গের জীবনী পাঠে উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক অনেক বিষয় শিখিতে পারেন। উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকিলে এবং প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলে, এখনও ভারতীয় যুবক রাজনীতিকুশল হইতে পারেন। রাজভক্ত হইয়া কিরূপে রাজসেবা করিতে হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনীতে বেশ জানিতে পারা যায়। রাজার সুনামের জন্য, রাজ্যের কল্যাণার্থ, প্রজার হিতকল্পে ইঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহার চিহ্ন ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই করদমিত্র রাজ্যত্রয় ইঁহারা কিরূপ অবস্থায় পান এবং শেষে কিরূপ অবস্থায় ত্যাগ করেন তাহা পাঠ করিলে ইঁহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। যে সকল শিক্ষিত যুবক রাজভক্ত হইয়া রাজসেবায়, চিরবন্ধুর রাজনীতি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে চাহেন, এবং দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন স্যর মাধব রাও ও স্যর সলর জঙ্গের জীবনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। ইঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী ক্রমে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং স্বীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র দেখিয়াছিলেন এবং রাজ্যের ও প্রজার উন্নতিকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ত্রিবাঙ্কুরকে সে সময়ে আদর্শ রাজ্য করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে তিনি G. C. S. I. উপাধি পান। মহারাজ ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইলেও তিনি একজন বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি "তুলাপুরুষধাম" ও" হিরণ্য গর্ভ" নামক দুটী ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং "কুলশেখর" পরিমল উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সালের ৫ই অগষ্ট তারিখে মহারাজের দেহত্যাগ হয়।

জনসাধারণের সুশিক্ষার জন্য যে সকল স্বদেশী-মহাত্মাগণ ধনে প্রাণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে স্যর সৈয়দ আহম্মদের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। ঈশ্বরচন্দ্রকে, সগুণ ঈশ্বরের ন্যায়, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন আদর্শে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি একাধারে, বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর, সমাজ-সংস্কারক ও সুশিক্ষাপ্রচারক। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাঁহার মহিমা সম্যক ও সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করা যাইতে পারে না। আর, সে সাগরের প্রতিবিম্ব শিশির-বিন্দুতে কিরূপেই বা প্রতিভাত হইতে পারে? কিন্তু তথাপি তাঁহার জীবনের পুণ্যকাহিনী না বলিলে অসম্পূর্ণতা দোষ হয়। সুতরাং তাঁহার জীবনগত সাধনার বিষয় যে বিদ্যা, তাহা, তিনি কি উপায়ে লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই বিদ্যা কি উপায়ে তিনি বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই সঙ্কল্পের উল্লেখমাত্র এখানে করা হইল।

বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়াছেন, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে মুসলমানগণের সুশিক্ষা বিধানের জন্য স্যর সৈয়দ আহম্মদও সেইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়াছেন। স্যর সৈয়দ আহম্মদ স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের উন্নতির জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে, স্বজাতিহিতৈষিতা যে কি পরম পদার্থ, তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায়। অধিকন্তু তাঁহার স্বাবলম্বনও বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণের শিক্ষার বিষয়। তিনি আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরাজের অধীনে ফৌজদারী আদালতে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২০ বৎসর। শেষে সদর আলার কার্য্য করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহাও তাঁহার স্বাবলম্বনের পরিচায়ক বলিতে হইবে।

অধুনা সাধারণের মধ্যে একটি ধারণা আছে, যে, পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত না হইলে, আমাদের দেশের লোকে জীবনে মহত্ব লাভ করিতে পারেন না। হবিষ্যান্ন ভোজী, ধুতি ও উত্তরীয় পরিধানকারী, নস্যসেবী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কথা আমরা দিন দিন ভুলিয়া যাইতেছি। আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আড়ম্বরশূন্য জীবন, আর এখন বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের সামান্য অশন বসনে পরিতোষ তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা—তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য—তাঁহাদের চিন্তার উচ্চতা—এখন ক্রমে কাহিনীর বিষয় হইতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই শ্রেণীর আদর্শ ক্রমেই হারাইতেছি। আর বোধ হয় সেই জন্যই আমাদের উৎকট বিলাসবাসনা, নিত্য অভাব ও সতত অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়া শরীর ও মনকে অবসন্ন করিতেছে। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, যে, বর্ত্তমান যুগেও আমরা দুই এক জন আদর্শ-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিতে পাই। ইহাঁদের মধ্যে বৃহস্পতিকল্প তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের জীবনের প্রধান কার্য্য। এ সম্বন্ধে তারানাথের জীবন আদর্শস্থানীয় ছিল। বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থ-পরতা বড়ই প্রবল। লোকে অর্থ ভিন্ন কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। বিদ্যা এখন একটী প্রধান পণ্য সুতরাং বিদ্যাদানের কথা এখন বড় শুনা যায় না। অধুনা প্রায় প্রত্যেক সহরে সুলভ বিদ্যালয় দেখা যায়। ইহার অধিকাংশ গুলিকে বিদ্যাবিপনি বলা যাইতে পারে। বিদ্যাদান বা সুশিক্ষা বিস্তার এ গুলির উদ্দেশ্য নহে। অর্থোপার্জ্জন এই গুলির উদ্দেশ্য। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে, যে কোন পল্লীতে দুই চারিটী উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র থাকিলে, অনেক নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র তাহাদিগের নিকট পাঠ বুঝাইয়া লইত। এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

এমন কি, সামান্য পল্লীগ্রামেও "প্রাইবেট টিউটার" নামক এক শ্রেণীর পণ্যজীবী দেখা যায়। সুতরাং আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে 'বিদ্যাদান' কথাটা বড়ই বিরল হইতেছে। তারানাথ এ বিষয়ে এক প্রকার অসাধারণ ছিলেন বলা যাইতে পারে। একবার জৈনদিগের প্রধান আচার্য্য বিজয়গচ্ছ কলিকাতায় আসেন এবং সেই সময় তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্যের সংস্কৃত শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য তারানাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার শিষ্যকে পড়াইবার জন্য মাসিক ৩০০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে তারা-নাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য; কারণ তাহাদ্বারা আমরা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তিনি বিজয়গচ্ছকে বলিলেন, "বিদ্যাদান করাই আমার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প। বিদ্যা বিক্রয় করা অতি পাষণ্ডের কর্ম্ম। আপনার প্রধান শিষ্য এবং অন্যান্য জৈনধর্ম্মাবলম্বী যে কোন লোক বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিবেন, আমি আনন্দের সহিত তাঁহাকে বিদ্যা শিখাইব।" বিদ্যাদান যে তাঁহার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প ছিল, তাহা তিনি নিজ মুখে জীবনের শেষভাগে প্রকাশ করেন। আমরা তাঁহার সঙ্কল্পের কথা অবগত হইলাম; ক্রমে তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলিব।

কৃতী পুরুষগণের পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিলে, আমরা তাঁহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিমাণ সুন্দররূপে বুঝিতে পারি। মান্দ্রাজ হাই-কোর্টের সুবিখ্যাত জজ স্যর মথুস্বামী আর্য্য কে, সি, এস্, আই, এবং বঙ্গদেশের হাইকোর্টের প্রধান দ্বিভাষী বহুভাষাজ্ঞ ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ শ্যামা-চরণ সরকারের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে তাঁহারা বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া অবস্থা উন্নত করিবার জন্য কিরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন। প্রথম জীবনে দুই জনেই ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত

করেন। দুই জনেই শৈশবে পিতৃহীন হয়েন। একজন মাতৃভাষা সামান্য শিক্ষা করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে মাসিক এক টাকা বেতনে চাকরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আর এক জন দারিদ্র্যপ্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ ইঁহাদের মধ্যে একজন শেষে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েন, অপর জন বাঙ্গালার হাইকোর্টের প্রধান দ্বিভাষীর পদ পান। দারুণ দুর্দ্দশা অতিক্রম করিয়া এ প্রকার সৌভাগ্য অর্জ্জন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল না হইলে, এরূপ অসাধারণ অবস্থা পরিবর্ত্তন কদাপি সম্ভবপর নহে। মথুস্বামী ও শ্যামাচরণ উভয়েরই ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেই জন্য ইহাঁদের সঙ্কল্পের সম্মুখে দারিদ্র্য অন্তরায় হইতে পারে নাই, বয়োধিক্য তাঁহাদের শিক্ষার প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই। একজন গ্রাম্যহিসাবনবীশের সহকারিতা করিয়া, অবসর সময়ে নিকটস্থ বিদ্যালয়ে গিয়া, ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অপর জন একবিংশ বৎসর বয়সে ইংরাজি শিক্ষা মানসে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হয়েন। দুর্ব্বলচিত্ত শ্রমকাতর যাহারা, তাহারা এইরূপ অবস্থায় পড়িলে সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু ধীর চরিত্র অন্যরূপ। মথুস্বামী ও শ্যামাচরণ আপন আপন জীবনে তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনোহরচরিত যতই আলোচনা করা যায়, ততই বুঝা যায়, কর্ম্মের মূলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আবশ্যক। অচল হিমগিরি সচল হইতে পারে, চন্দ্রসূর্য্য আপন আপন কক্ষভ্রষ্ট হইতে পারে, তথাপি জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই জগতে কৃতিত্ব লাভ করেন। অন্যথা কল্পনাযোগে শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণ করিলে, পদে পদে হতাশ হইতে হইবে। ভিন্নগতি বাত্যাসে

যাহাদের বাসনা টলে, ক্ষুদ্র বিঘ্নে যাহারা হতজ্ঞান হয়, ঐশ্বর্য্যে যাহারা উৎফুল্ল হইয়া আত্মহারা হয়, দারিদ্র্যে যাহারা অবসন্ন হয়, তাহাদিগের দ্বারা জগতে কবে কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে? অল্পবুদ্ধি বরং ভাল, সল্পবিত্ত বরং শ্রেয়, দুর্ব্বলদেহ বরং মঙ্গল, কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত কদাপি ভাল নহে। ভগবানের কৃপায় সতত আস্থাবান হইয়া, আশাপূর্ণ হৃদয়ে সাহসে নির্ভর করিয়া, কৃতসঙ্কল্প হইয়া যিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তিনি পুরুষ নামের উপযোগী। মথুস্বামী ও শ্যামাচরণে এই পৌরুষ ছিল; এবং এই জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা আমাদের যুবকগণের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন।

জাতীয় উন্নতির সহিত জাতীয় সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালাভাষা যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গভাবা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্যের এখন যে কোন ভাষার গদ্য পদ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তুলনায় ইহারা ম্লান হইবে না। যে সকল মহাত্মার সাধনায় বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে দত্তদ্বয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। গদ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত ও পদ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ইঁহারা কি প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশীয় যুবকগণের জানা উচিত। যে সকল যুবক জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা যেন এই সাহিত্যসাধকদ্বয়ের জীবনী মনোযোগের সহিত পাঠ করেন।

যদি কোন যুবক আর্থিক ও শারীরিক ক্লেশকে আপন সঙ্কল্প সাধনার অন্তরায় বিবেচনা করেন এবং তজ্জন্য নিরাশ ও অবসন্ন হয়েন তবে তিনি

যেন অক্ষয়কুমারের সাধনার কথা শুনেন। অক্ষয়কুমার দরিদ্রের সন্তান। অর্থাভাবে বিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। দরিদ্রতা হেতু অল্প বয়সে তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় থাকিতে হয়। ক্রমে ১৯ বৎসর বয়সে তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালায় ৮৲ বেতনে পণ্ডিতের কাজ হয়। বাল্যে কিঞ্চিৎ পারসী এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে কিছু ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। শার্দ্দুলশিশু শোণিতের আস্বাদন অল্প পাইলেও তাহা ছাড়িতে চাহে না। তাহার জন্য সে কোন বাধা মানে না। অক্ষয়কুমারও সেইরূপ বিদ্যার স্বাদ যদিও বাল্যে অতি অল্পই পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ছাড়িতে পারেন নাই। পরিবার প্রতিপালন ও জীবিকার জন্য অল্প বেতনে শিক্ষকতা করিয়া তিনি ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে ক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠা ভাজন হয়েন। তিনি দেহ পাত করিয়া জ্ঞানের সেবা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছেন। বাল্যকালের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জীবনে পূর্ণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে।

কবি কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন বলিয়া একটী কিম্বদন্তী আছে। তিনি এক সময়ে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, "উষ্ট্র" শব্দ স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের সেই এক দিন, আর রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূতের রচনার কাল আর এক দিন। মূর্খতা ও পাণ্ডিত্য এই দুইয়ের চরমসীমা কালিদাসের জীবনে দেখা যায়। আর বোধ হয় সেই জন্যই লোকে তাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র বলে। অর্থাৎ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, কঠোর সাধনা দ্বারা বাগ্‌দেবীকে প্রসন্ন করিয়া বর পাইয়াছিলেন। এই হিসাবে, মধুসূদন দত্তও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তিনি এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় এত অজ্ঞ ছিলেন, যে "পৃথিবী" ও "প্রথিবী" এই দুইয়ের

মধ্যে কোনটী শুদ্ধ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আবার যখন দেখি যে, এই মধুসূদনই বাঙ্গালা পদ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তখন বিস্মিত চিত্তে তাঁহার অসাধারণ সঙ্কল্প ও সাধনার কথা চিন্তা করি। এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। সেই বিজাতীয় ঘৃণাকে অতিক্রম করিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠে প্রবৃত্ত হওয়া আর তাহার পরে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ছাত্রের ন্যায় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করায় যে তাঁহার মনের বিশেষ বল প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। এইখানে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার হৃদয়নিভৃতে লুক্কায়িত সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অনুভব করি। পরে সেই সঙ্কল্পের সাধনা যে কিরূপে করিয়াছিলেন তাহাও দেখিতে পাই। মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ করিলে, এবং মধুসূদন "মাইকেল" না হইলে হয়ত লোকে অনায়াসে তাঁহার এই বিদ্যালাভকে দৈবাধীন বলিত এবং বাগ্‌দেবী সাক্ষাৎভাবে আসিয়া তাঁহাকে বর দিয়াছেন বলিয়া একটা কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিত। মধুসূদন কিপ্রকার বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও বঙ্গভাষার উন্নতির সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে পাওয়া গেল।

এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর লোক আপন আপন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলের যে কোনটী লাভের জন্য যিনি সাধনা করিয়াছেন, তিনি তাহারই পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সাধককে আদর্শ পাইয়াছেন। এতক্ষণ বিভিন্ন শ্রেণীর সাধক-গণের কথা বলিলাম। এইবার লক্ষ্মীর উপাসকগণের কথা বলিতেছি। ইহাঁরা "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মন্ত্রের উপাসক। বণিকপ্রবর রামদুলাল সরকার ও স্যর জেমসেটজী জিজিভাই এই শ্রেণীর সাধক ছিলেন।

রামদুলাল ও জেমসেটজী উভয়ে ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েরই বাল্যজীবন দুঃখে, দারিদ্র্যে অতিবাহিত হয়। রামদুলাল অল্প বয়সে পিতৃমাতৃ হীন হইয়া মাতামহ ও মাতামহীর ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রতিপালিত হন। জেমসেটজীর শৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। এবং শ্বশুরের অন্নে কিছুদিন জীবন ধারণ করেন। রামদুলাল উত্তমরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহার সুশিক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাগজের অভাবে কদলী পত্রে তাঁহাকে লিখিতে হইত। জেমসেটজীর 'লেখাপড়া শিক্ষার কথা তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তবে তিনি গুজরাটী ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারিতেন এবং যৎসামান্য ইংরাজী জানিতেন। বাঙ্গালী রামদুলাল ৫৲ টাকা বেতনে চাকরী আরম্ভ করেন। পারসী জেমসেটজী কিছুদিন দোকানে বিনা বেতনে শিক্ষানবীশ ছিলেন। কিন্তু দুই জনের বাল্যকাল হইতে বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। একজন তাঁহার সামান্য আয় হইতে অতিকষ্টে শত মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া কাঠের ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন, অপর জন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ১২০ মুদ্রা লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আপাতঃ দৃষ্টিতে ঘটনা দুটী সামান্য বোধ হয়, কিন্তু যখন আমরা এই প্রসিদ্ধ বণিকদ্বয়ের উত্তর জীবনের কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করি, তখন ঐ দুটী সামান্য ঘটনার মধ্যে তাঁহাদের সঙ্কল্পের অবিনশ্বর অঙ্কুর দেখিতে পাই। অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত সেই সঙ্কল্পের কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র ভারতে আজ এই সিদ্ধ পুরুষদ্বয়ের পুণ্যকথা ঘোষণা করা আবশ্যক। দাসত্ব-প্লাবিত দেশে কি উপায়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারা যায় তাহা শিখিবার জন্য এই দুই জন কৃতীপুরুষের জীবনী পাঠ করা আবশ্যক।

ক্রমে ক্রমে আমরা কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবনের সঙ্কল্পের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। সঙ্কল্পের কথা চিরকালই সংক্ষেপ হইয়া থাকে। ঐ যে বিশাল বিস্তৃত বটবৃক্ষ—যাহার বিস্তার দেখিয়া এখন আমরা বিস্মিত হইতেছি,—কিছুকাল পূর্ব্বে উহা ক্ষুদ্রতম বীজে প্রকৃতির সঙ্কল্পরূপে লুক্কায়িত ছিল। জগতে মহাপুরুষগণের যে সমুদায় মহীয়সী কীর্ত্তি দেখিতে পাই সেগুলিও একদিন সেই মহাপুরুষগণের হৃদয় নিভৃতে সঙ্কল্পরূপে অতি সঙ্কীর্ণভাবে লুক্কায়িত ছিল। সাধনায় সঙ্কল্পের বিকাশ, সিদ্ধিতে তাহার স্থিতি। সঙ্কল্পের সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এক্ষণে সঙ্কল্প সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, উহা গোপনে রাখা আবশ্যক। মানবচরিত্রজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।" অধিকন্তু সঙ্কল্প—"প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানি স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ।"

সাধনা।

সিদ্ধিদাতা ভগবানকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঈপ্সিত বস্তুকে ধ্রুব তারার ন্যায় নিরন্তর সম্মুখে রাখিয়া গম্যপথে যাইতে হইবে। অন্যথা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে, বিপথে গমন করিলে, বিপন্ন হইবার সম্ভবনা।

কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষকার প্রধান সহায় এবং অবলম্বন হইলেও দৈবানুগ্রহ উপেক্ষনীয় নহে। সাধনায় পুরুষকার ও দৈবের সম্মিলনে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হয়। অতএব কর্ম্মেচ্ছু যুবক মাত্রেরই ভগবদ্ভক্ত হওয়া আবশ্যক। আত্মশক্তিতে ও সঙ্কল্পে যেরূপ অচল অটল বিশ্বাস ব্যতিরেকে সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র হয়, তদ্রূপ ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় ও কৃপায় দৃঢ়বিশ্বাস ব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের অগ্রসর হইবার প্রয়াসও এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হয়—আশা ভগ্ন হয়—এবং ক্রমে সাধনা ব্যর্থ হয়। নাস্তিকের জীবন নিরাশ। ইহ পরকালে কোথাও তাঁহার আশা নাই। তাঁহার সুখ দুঃখ আত্মগত। তাঁহার দেহের সহিত তাঁহার সকলই ফুরাইয়া যায়। সিদ্ধিতে সন্দিহান হইলে তিনি সাধনা ছাড়িয়া দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নাস্তিক বা ভগবৎকৃপায় অনাস্থাবান ব্যক্তির সাধন বিড়ম্বনা মাত্র।

অন্যত্র আস্তিক ভগবদ্ভক্তজনের পক্ষেও সাধনা সহজ নহে। তবে উভয়ে প্রভেদ এই যে একজন নিরাশ হৃদয়ে সমস্ত কৃতিত্ব নিজের এই বিশ্বাস লইয়া কার্য্য করেন। অপর জন আশার আলোকে সঙ্কল্পিত বিষয় সম্মুখে রাখিয়া আত্মশক্তি বা পুরুষকারে বিশ্বাস করিয়া আরব্ধ কার্য্যে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সিদ্ধি অসিদ্ধি বা জয় পরাজয়ের চিন্তা না

করিয়া কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করেন। একজন কর্ম্মফল, কৃতিত্ব নিজেতে আরোপ করেন। অন্যে নিজকৃত সাধনার ফল সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি কর্ত্তব্যবোধে সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া থাকেন—কর্ম্মে মাত্র তাঁহার অধিকার আছে—কর্ম্মফল ভগবানের হস্তে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সংক্ষেপতঃ যিনি এইরূপে, মনে প্রতিজ্ঞার বল, মস্তকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, হৃদয়ে ভক্তি, ও বাহুতে শক্তি লইয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন—তিনিই ধন্য—কর্ম্মক্ষেত্রে তিনিই আদর্শপুরুষ।

সাধনার অনেক অন্তরায়। ঐশ্বর্য্যের উল্লাস, ও দারিদ্র্যের অবসাদ উভয়ই অন্তরায়। সুখৈশ্বর্য্যে আত্মহারা হইয়া কেবল ভোগ বিলাস ও পাপলালসার বৃদ্ধিতে সাধনা পণ্ড হয়। আবার দারিদ্র্যজনিত অভাবে ভয় লোভ ও ঈর্ষা প্রভৃতির বৃদ্ধি পাইয়া চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করে। এই সকল দমন করিবার জন্য আত্মসংযম শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদের দেশে লোকে জীবনকে ব্রত স্বরূপ বিবেচনা করে। এবং সেই জন্য আমাদের সর্ব্ব কার্য্য ধর্ম্মসম্পর্কিত। ভোজনে জনার্দ্দন হইতে শয়নে পদ্মনাভ পর্য্যন্ত দিবারাত্র সর্ব্বকর্ম্মে ভগবানকে কোন না কোন রূপে স্মরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। আরও দেখা যায় যাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে হবিষ্যান্ন বা নিরামিষ কিম্বা অলবণ আহার করিয়া সংযম করেন। সুতরাং সংযম কথাটী কাহারও নিকট বড় নূতন নহে। নিত্য নৈমিত্তিক ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্রতাদির পক্ষে যখন এরূপ ব্যবস্থা তখন ইহপরকালব্যাপী এই জীবনমহাব্রতের উদ্‌যাপনের জন্য কি পরিমাণে আত্মসংযম আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়্‌রিপুর কোন না কোনটী প্রবল হইলেই সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। অতএব সর্ব্বকার্য্যে রিপুর দমন চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যথা শ্রেয়ঃ নাই।

প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে চলিলে সর্ব্বদা বিপথ গমনের শঙ্কা থাকে। এবং তাহাতে প্রায়ই বিপদ ঘটে। প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে কার্য্য করিলে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব হারায়। বিবেক ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি ম্লান হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রিপু পরবশ সে ক্রীতদাস অপেক্ষাও হীন। ক্রীতদাসের শারীরিক স্বাধীনতা নাই। কিন্তু যে রিপুর দাস তাহার শারীরিক মানসিক কোন স্বাধীনতাই নাই। যাহার মন সতত পাপপথগামী তাহার দেহ কি প্রকারে অন্যপথগামী হইতে পারে? এইরূপ রিপুপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা কখন কোনও সৎকার্য্য সম্ভবপর নহে। জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য সাধন তাহার দ্বারা কিরূপে হইতে পারে? জীবনকে উন্নত করিতে হইলে, জীবনকে মহৎ করিতে হইলে, রিপুবশ করিতে হইবে। যখন মানব রিপুনিচয়কে নিজ অধিকারে আনিতে পারেন তখন ত রিপু সকল পরিচারকের ন্যায় তাঁহার সাধনের সহায় হইয়া থাকে।

রিপু দমন চরিত্র গঠনের সাহায্য করে। চরিত্রবান ব্যক্তি সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রশংসিত হয়েন। তাঁহার সচ্চরিত্রতার জন্য, তাঁহার সাধুতার জন্য তিনি স্বয়ং আপনার মধ্যে যেমন একটী অব্যক্ত শক্তি অনুভব করেন, তেমনই আবার অপর সাধারণেও তাঁহার চরিত্রের শক্তি বুঝিতে পারে। লোকে তাঁহার গন্তব্যপথে বাধা দিতে সাহস করে না। চরিত্রবান ব্যক্তি আলোকস্বরূপ—স্বপ্রকাশ। তিনি যেখানে উপস্থিত হয়েন কুলোকসকল অন্ধকারের ন্যায় সেখান হইতে দূরে যায়। চরিত্রের এমনই মহিমা। অতএব দেখা যাইতেছে যে বিঘ্নবহুল সাধনক্ষেত্রে বহু বিঘ্ন চরিত্রের প্রভাবে দূর হয়। এরূপ স্থলে কোন বুদ্ধিমান কর্ম্মেচ্ছু যুবক আত্মসংযমাদি দ্বারা চরিত্রে গঠনের চেষ্টা না করিবে? নিষ্কাম ধর্ম্মের হিসাবেই হউক অথবা সকাম সাংসারিকতার হিসাবেই হউক সচ্চরিত্রতার প্রভাব ও মর্য্যাদা যথেষ্ট।

আত্মসংযম ও চরিত্র গঠন জীবনব্যাপী কার্য্য। "আমি আত্ম-সংযম ও চরিত্র গঠন করিয়াছি, এক্ষণে নিশ্চিন্ত থাকা যাউক" এরূপ কথা কেহ কখন জীবনে বলিতে পারেন না। নগর অধিকার করিয়া শত্রুসেনা পরাজিত করিয়া কোন দিন নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব, কিন্তু মানবের ষড়রিপু দমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব। এ জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের রিপু ও চরিত্র বিষয়ে সতত সতর্ক থাকেন। অভ্যাসযোগে কিছুদিন রিপুগণ দমিত থাকিলে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করে। যখন এইরূপে আত্মসংযম অভ্যস্ত হইয়া আসে, চরিত্র গঠন হইতে থাকে তখন অন্তরের চঞ্চলতা চলিয়া যায়। বৃথা বাসনায় চিত্তে চঞ্চলতা উৎপাদন করে না। তখন অধ্যবসায় আসে। আশা ও অধ্যবসায় সাধনার প্রাণ। আশা ও অধ্যবসায় না থাকিলে সাধনা হইতে পারে না। দীপবর্ত্তিকা নিবাত নিষ্কম্প হইলেও তৈলের অভাবে নিভিয়া যায়। সেইরূপ চিত্ত সংযত হইলেও আশা ও অধ্যবসায় না থাকিলে সাধনা স্থায়ী হইতে পারে না, এই নিমিত্ত আশা ও অধ্যবসায় আবশ্যক।

নিরানন্দ হইয়া সাধনা করা বড় কষ্টকর। আশান্বিত হৃদয়ে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত সাধনায় রত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমশঃ সাধনা প্রীতিকর হইবে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে যুবকগণ ঈশ্বরবিশ্বাসী হইবে। ভক্তবিশ্বাসীগণ বলেন যে ভগবান আনন্দস্বরূপ। তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে আস্থাবান হইয়া নিরা-নন্দ থাকা ভাল দেখায় না। তাহা হইলে কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকিবে না—একটী অপরটীর প্রতিবাদ করিবে। আনন্দই জগতের নিয়ম। দুঃখ তাহার বিকারমাত্র। অথবা আনন্দ সম্যক্‌ভাবে অনুভব করিবার জন্য দুঃখের সৃষ্টি। আনন্দ জীবনবর্দ্ধক। দুঃখ জীবনক্ষয়কারী। অতএব মনকে সর্ব্বদা এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে তাহা

যেন সর্ব্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকে। দুস্তর সাগর বক্ষে অনেক ভাসমান "বয়া" দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলিকে দেখিয়া নাবিকগণ তাহাদের পথ নির্ণয় করে। ঐ বয়া সকল প্রবল তরঙ্গাঘাতে বা ঝটিকাবর্ত্তে নিমগ্ন হয় না। সকল সময় সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া ইহারা ভাসমান থাকে, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে আপনাদের কার্য্য করে। আমাদের হৃদয় যাহাতে ঐ প্রকারে অবস্থার উপর ভাসমান থাকে তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। হৃদয় ও মনকে এইরূপে প্রসন্ন রাখিতে হইলে আশার আবশ্যক। আশা ভিন্ন আনন্দ স্থায়ী হইতে পারে না। যুগে যুগে যত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আশাতে ভগবানের আশ্বাসবাণী শুনিয়া নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও প্রসন্ন চিত্তে আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমরা ও আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে কি দেখিতে পাই? আশা। আশার আলোকে যদি ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিয়া কিছু না দেখিতে পাইতাম তবে কিসের জন্য এত উদ্যোগ, এত আয়োজন? আমাদিগের শ্রম, অর্জ্জন এবং সঞ্চয়ের মূলে আশাই দেখিতে পাই। আশান্বিত হইয়াই লোকে ভূমিকর্ষণ করে, বীজ বপন করে, তাহাতে জল সেচন করে। আশা না থাকিলে এ সকল কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আশা কর্ম্মের জীবনস্বরূপ—কর্ম্ম যত অগ্রসর হয় আশা তত বৃদ্ধি পায়।

আশা অধ্যবসায়কে স্থায়ী করে। অধ্যবসায় সাধনার প্রধান অঙ্গ। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় না থাকিলে সকল সাধনা ব্যর্থ হয়। অধ্যবসায় এবং সাধনা, আলো ও উত্তাপের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সাধনক্ষেত্রে সকল অন্তরায়কে অতিক্রম করিতে হইলে অধ্যবসায় আবশ্যক। বারম্বার বিফলপ্রযত্ন হইয়া বাধা পাইয়াও সাধনা করিতে হইবে; অন্যথা সামান্য বাধায় কাতর হইলে সকলই পণ্ড হইবে। কথিত আছে ধর্ম্ম-

জগতে সাধনক্ষেত্রে "মারের" প্রবল প্রতাপ। "মার" নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কখন ভোগসুখের নানা মনোরম চিত্র সম্মুখে ধরিয়া সে সাধককে বলে,—"কেন এমন কমনীয় বপু, তপ্ত-কাঞ্চননিভবর্ণ, কঠোর ধর্ম্ম সাধনে মলিন ও ক্ষয় করিতেছ? সংসার দুদিনের জন্য। তুমি চলিয়া গেলে কি থাকিবে? কিছুই না। তবে কেন এমন করিয়া মরিতেছ? সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সাধনা করিও না। আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ, তোমার সম্মুখে কত লোক মর্ত্তে স্বর্গের সুখ ভোগ করিতেছে, জীবন যৌবন সার্থক করিতেছে—কেমন বিলাস বিভ্রমে দিন কাটাইতেছে। দেখ সদ্যঃ প্রস্ফুটিত গোলাপের শোভা ক্ষণ-স্থায়ী। হেলায় যদি তাহা উপভোগ না কর, তবে কালের কঠোর নিয়মে তাহারা ঝরিয়া যাইবে। অতএব এ নশ্বর জীবন, ক্ষণস্থায়ী যৌবন, এ ক্ষণবিধ্বংসী দেহ, এমন করিয়া অজ্ঞাতফল ধর্ম্মের জন্য ভাসাইয়া দিও না। একবার যাইলে পুনরায় যে আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? অতএব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভোগ সুখে জীবন যৌবন সার্থক কর।" এইরূপে নানা ছন্দে "মার" সাধকের মন বিচলিত করিতে চেষ্টা করে। এই সকল চিত্র দর্শনে "মারের" প্ররোচনায় অনেকেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সাধনভূমি হইতে দূরে যান। আবার অনেকে সুখের এই মোহময় চিত্রে মুগ্ধ হন না। কখনও বা তাঁহাদিগকে অন্য উপায়ে সাধনভ্রষ্ট করিবার জন্য "মার" বিশেষ চেষ্টা করে। তাঁহাদিগকে বিভীষিকা দেখায়। শ্মশান-ক্ষেত্রের শব সাধনার প্রথম অবস্থায় তান্ত্রিক যেমন নানা প্রকার বীভৎস পিশাচমূর্ত্তি দেখেন সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মশীল কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তব্য সাধনে যে তদ্রূপ নানা বিভীষিকা দেখিতে পাইবেন—তাহার আর বিচিত্র কি? মানবের কর্ম্মক্ষেত্রেও যেন "মার" কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এবং কল্পনার সাহায্যে তাঁহাকে নানা

দুঃখের চিত্র দেখায়। পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া কষ্ট দেয়। দুঃস্থ স্নেহশীল আত্মীয়জনের পীড়ার চিত্র অথবা অন্য কোন প্রকার বিচ্ছেদ, মনঃকষ্ট, বা পারিবারিক দুর্ঘটনার চিত্র দেখাইয়া তাঁহাকে ভীত ও অবসন্ন করিতে প্রয়াস পায়। ইহাতে যিনি কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না—"মার" তাঁহার সম্মুখে মিথ্যাযুক্তির সাহায্যে তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মের ঔচিত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত করে। যখন সাধনা করিতে করিতে দেহমন ক্ষণিকের জন্য অবসন্ন হয় সেই সময় "মার" অবিশ্বাসকে সাধকের মনে প্রবেশ করিতে বলে। যুক্তি তর্কস্থলে মিথ্যাযুক্তির দ্বারা কূটন্যায়ের সাহায্যে তাঁহার মনে ভগবানে অনাস্থা এবং আশায় নিরাশা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে। এই সকল সঙ্কটে অধ্যবসায় আবশ্যক। অধ্যবসায় না থাকিলে অবসাদে দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিজ কর্ত্তব্যের ঔচিত্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সঙ্কল্প শিথিল হয়, সাধনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। এই সকল বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক। এই জন্য ভগবানের কৃপায় দৃঢ়বিশ্বাস রাখিতে হইবে, তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করিতে হইবে—সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিতে হইবে—আর সর্ব্বোপরি অধ্যবসায় সহকারে দেহপাত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া সাধনায় রত থাকিতে হইবে। ইহাই সাধনার প্রকৃষ্টরীতি—ইহাই সিদ্ধির সুগমপথ—ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্কল্পের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সাধনপ্রসঙ্গ বিবৃত করা যাউক। যখন রামমোহন রায় আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য পাটনায় আসেন সে সময়ে দেশে গমনাগমনের জন্য সুগম ও নির্ব্বিঘ্ন পথ ছিল না। তখন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির কথা কেহ জানিত না। বিদেশ যাত্রা করা একটা বিষম ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত।

স্থলপথে ব্যাঘ্র ভল্লুক ও বন্যশূকরাদির আক্রমণ হইতে যদিও কোন রূপে লোক আত্মরক্ষা করিতে পারিত কিন্তু দস্যুদল ও ঠগদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই সুকঠিন ছিল। ঠগেরা নানা বেশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। কখন সাধু সন্ন্যাসীর বেশে, কখন বণিকের বেশে, কখন বা ভদ্রলোকের বেশে পথিকের সহিত পথে কিংবা পান্থশালায় মিলিত হইত এবং পথিককে বিপথগামী করিয়া সুযোগ মত সঙ্কেত দ্বারা আপন দলস্থ অন্যান্য ঠগদিগকে একত্র করিয়া পথিকের প্রাণ নাশ করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিত। জলপথেও বিঘ্ন কম ছিল না। জল দস্যু বোম্বাটীয়াগণ "কালহাঁড়ী"মাথায় দিয়া নৌকার কাছে কাছে বেড়াইত এবং সুযোগ মত নৌকা লুণ্ঠন করিত। তখন পুলিসের এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল না। বিদেশ গমনের পথের বিবরণ শুনিলেই অনেকের অঙ্গের শোণিত শীতল হইয়া যাইত। ধনতৃষ্ণা, জ্ঞানতৃষ্ণা সমস্তই হৃদয়ে বিলীন হইয়া যাইত। অধুনাতন সর্ব্বদেশচর বঙ্গবাসীর পক্ষে সে দিনের কথা কষ্টকল্পনার বিষয়। তখন ধনার্জ্জনের জন্যও বঙ্গবাসী বিদেশে কম গমন করিতেন। অপ্রবাসী হইয়া শাকান্নভোজী হইয়া থাকাও তখন লোকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত। সম্পন্নব্যক্তি নিজের জমিদারীর আয়, সচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থ লাখেরাজ দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর জমির উৎপন্ন শস্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। শ্রমজীবী স্বীয় ব্যবসায় দ্বারা আপনার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া স্বদেশেই থাকিত। বিশেষ আবশ্যক না হইলে লোকে বিদেশ গমনের কথা মনেই আনিত না। দেশের ও সমাজের যখন এমন অবস্থা তখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য দ্বাদশবর্ষীয় বাঙ্গালী বালকের সুদূর বিহার প্রদেশে আসা বিশেষ সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে। জ্ঞানান্বেষণে পাটনায় আগমন রামমোহনের জীবনের সাধনার আরম্ভ।

পাটনায় অধ্যয়নকালে মহম্মদীয় শাস্ত্র সমূহে একেশ্বরবাদের প্রতি

তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত পৌত্তলিকতায় সন্দেহ হয়। বয়সের সহিত ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাটনায় আরবী ও পারসী ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন হইয়া তিনি সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীধাম যাত্রা করেন। অদ্যাপি বারাণসীক্ষেত্র সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে নবদ্বীপ, কাশী, ও পুণা এখনও সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই তিন স্থানের মধ্যে কাশীতে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রচর্চ্চা উত্তমরূপে হইয়া থাকে। প্রকৃত সাধক যাঁহারা তাঁহারা সাধনের জন্য চিরকাল পীঠস্থান অন্বেষণ করেন। পীঠস্থানই সাধনের প্রকৃষ্টভূমি। সাধক স্বয়ং সেখানে থাকিয়া সাধন করেন। পাটনায় তৎকালে আরবী ও পারসী শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—সুতরাং সেইখানেই ঐ ভাষাদ্বয় শিখিতে হইবে—কাশীতে বেদবেদাঙ্গ উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায় অতএব ঐখানে ঐ সকল শাস্ত্রালোচনা করিতে হইবে বলিয়া তিনি বাগ্দেবীর সেই সেই পীঠস্থানে ঐসকল বিষয় অধ্যয়ন করিলেন। এই সকল ঘটনাতে রামমোহন রায়ের চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে। পাটনায় মুসলমান শাস্ত্রে একেশ্বরবাদের যুক্তি ও প্রশংসা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন; পরে যখন কাশীধামে উপনিষদাদি পাঠ করিলেন তখন তাহাতে ও একেশ্বরবাদের যুক্তি ও প্রশংসা দেখিয়া তিনি বড়ই পুলকিত হয়েন। এত দিনে সন্দেহ দূর হইল। প্রচলিত পৌত্তলিকতায় তাঁহার অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। তিনি পৌত্তলিকতার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এই সময়ে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকা প্রকাশের সময় তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র ছিল। প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মকে এইরূপে আক্রমণ করাতে হিন্দু সমাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে লোকে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। সুযোগ পাইলে এই সকল নিন্দুকেরা তাঁহাকে নির্য্যাতন করিত। বাহিরের লোকের ত এই

ভাব। গৃহে পিতা রামকান্ত, পুত্রের এতাদৃশ ধর্ম্মমত দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রমে পিতাপুত্রে এরূপ হইল যে, রামমোহনকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে হইল। যে কালে বাঙ্গালীর ছেলে ষোল বৎসর বয়সেও হেড়ে ডুগ ডুগ ডাঙ্গাগুলি কুস্তিকসরতে দিন কাটাইলে কেহ নিন্দা করিত না, সে সময়ে অত অল্প বয়সে রামমোহন রায় ধর্ম্মমতের জন্য, নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহার সাধনের জন্য, সমাজের নিন্দা ও নির্য্যাতন, পিতার ক্রোধ ও গৃহত্যাগ সহ্য করা কম সাধনানুরাগের কথা নহে। এই সকল বিপত্তিতে তিনি একদিনের জন্য সাধনক্ষেত্রে বিচলিত হয়েন নাই।

তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ দেখিয়া ভয় হয়। কিন্তু যখন মানুষ জলধিবক্ষে পতিত হয় তখন সেই উত্তাল তরঙ্গ তাহাকে নিমগ্ন না করিয়া অনেক সময় ভাসাইয়া লইয়া যায়; ভয়ের স্থানে ভরসা দেয়। জীবনের ঘটনাস্রোতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আপাততঃ দৃষ্টিতে যাহা অসুবিধা তাহাই আবার সুন্দর সুযোগরূপে পরিণত হয়। মহাপুরুষ রামমোহনের গৃহত্যাগ আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও উহাতে সুমঙ্গল ঘটিয়া ছিল। গৃহতাড়িত হইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার জন্য তিব্বত দেশে উপস্থিত হয়েন। সেখানে তাঁহার জীবন নিরাপদে ছিল না। যে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য গৃহতাড়িত হয়েন সেই স্বাধীনমত সেখানে প্রকাশ করাতে লামাগণ তাঁহার উপর খড়্গ হস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রামমোহনের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তিনি এত বিপন্ন হইয়া ও স্বীয় ধর্ম্মমত প্রকাশে পশ্চাদ-পদ হয়েন নাই। নিজের সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং প্রাণপণ করিয়া তাহার সাধন করিতে ছিলেন। এইখানেই মহত্তের মহত্ত্ব। পিতৃকর্ত্তৃক গৃহতাড়িত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে দেশ বিদেশে

ভ্রমণ করিতে করিতে চারি বৎসর অতীত হইল। তাহার পর তিনি দেশে ফিরিলেন।

রামমোহন রায় স্বদেশে থাকিয়া মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ঐ দুই ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানতৃষ্ণা উহাতে তৃপ্ত হইল না। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইবার মানসে তিব্বতে গমন করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিতগণের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের তত্ত্বকথা অবগত হইয়া দেশে ফিরিলেন কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্মজ্ঞানের তৃষ্ণা মিটিল না। খ্রীষ্টানরাজ ইংরাজের ধর্ম্মশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বকথা অবগত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যগ্র হইল। তাঁহার বয়স এই সময়ে দ্বাবিংশ বৎসর। অনেকে এ বয়সে লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করেন এবং বাল্যের সহিত বিদ্যাচর্চ্চার ব্যাপারটা অতীতের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেকে এ বয়সে বিদ্যাশিক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করেন। কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রায় সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন প্রাণপণ করিয়া তাহার সাধনা করিতে কখন পশ্চাদপদ্ হয়েন নাই। সেই জন্য আমরা তাঁহার দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তাঁহাকে পাঠনিরত ছাত্রের ঐকান্তিকতার সহিত ইংরাজী শিখিতে দেখিতে পাই। এত অধিক বয়সে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া, এবং তৎকালের সৎশিক্ষা ও সৎগ্রন্থের অভাব সত্ত্বেও তিনি উক্ত ভাষা সম্যকরূপে অধিগত করেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী ইংরাজগণ তাঁহার ইংরাজী রচনা প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। এখনও যাঁহারা তাঁহার লেখা পাঠ করেন তাঁহারাও তাঁহার ইংরাজী রচনা কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ইংরাজী শিখিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্র ত পাঠ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও মনের তৃপ্ত হইল না। যে ভাষায় আদি

বাইবেল রচিত হয় সেই ভাষায় বাইবেল পাঠ করিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি লাটীন ও গ্রীক ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের অন্যান্য সমস্ত কার্য্যের কথা যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় আর একমাত্র তাঁহার এই বিবিধ ভাষা জ্ঞানের কথা আলোচনা করা যায় তবে তাহাতে তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এরূপ সাধনার ক্ষমতা না থাকিলে আজ কি তিনি জগতের মহজ্জনগণের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন? রাজা রামমোহন রায় জগতে যে, একটী সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রচার প্রয়াসী ছিলেন এমত নহে; স্বদেশ, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এবং সেই জন্য কঠোর সাধনাও করিয়াছিলেন। তিনি স্থিতিশীলতার বিরোধী ছিলেন। ক্রমোন্নতিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই জন্য কি রাজবিধি সংস্কার, কি সমাজ সংস্কার, আর কি শিক্ষা সংস্কার তৎকালীন সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল। এই জন্য দেশের ও সমাজের রক্ষণশীলগণের সহিত তাঁহাকে সতত সংগ্রাম করিতে হইত। তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রবল প্রতিরোধ উপেক্ষা ও অতিক্রম করিয়া তিনি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় এতাবৎকাল একান্ত মনে নানা ভাষা ও শাস্ত্রালোচনা করিতে ছিলেন। পিতার সহিত মতভেদ হইলেও এতদিন পিতার পুত্র ছিলেন। সংসার প্রতিপালনের ভার, পরিবার ভরণপোষণ ও সমাজিক মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার তাঁহার পিতারই ছিল। সুতরাং এতদিন তাহাকে সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু অতঃপর তাঁহার আর সে সুবিধা রহিল না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার দেহান্ত হইলে তাঁহারই উপর সংসারের ভার পড়িল। তিনি এই সময়ে

রংপুরে কলেকটারীতে দেওয়ানের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ডিগবী সাহেব তখন রংপুরের কলেক্টর। ইনি একজন গুণী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন ও তাঁহার মধ্যে প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার তদনুরূপ ছিল না। ডিগবী সাহেব রামমোহনের গুণগ্রামের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। তিনি রামমোহনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রামমোহনও স্বীয় প্রভুকে গুণী ও গুণগ্রাহী দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান হয়েন। শ্রদ্ধা ও প্রীতি বন্ধুতার মূল। ডিগবী ও রামমোহনের মধ্যে তাহা ছিল। ক্রমে তাঁহারা বন্ধুতাপাশে বদ্ধ হয়েন। রংপুরের কর্ম্ম গ্রহণের কিছুকাল পরে তাঁহার অপর দুটী ভ্রাতার কাল হয়। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহাদের বিষয় রামমোহন প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে চাকরী ও বিষয়ের আয়ে তাঁহার অবস্থা বেশ সম্পন্ন হইয়া উঠিল। তিনি নিজের আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া চাকরী ত্যাগ করিলেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে আপনার অভীষ্ট বিষয়ের সাধনায় রত হইলেন। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে পিতার ক্রোধ, অর্থকৃচ্ছতা, বিদেশ ভ্রমণের ক্লেশ ও নানা প্রকার বিপদ কিছুই তাঁহাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। আবার এখন দেখিতেছি সংসারিক সুখ, প্রভুর সখ্য, প্রচুর অর্থাগম, ও অন্যান্য নানা প্রকার সুখৈশ্বর্য্য তাঁহাকে তাঁহার সাধন ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারিল না। প্রকৃত সাধক সর্ব্বাবস্থায় এই প্রকার অবিচলিত থাকেন। দুর্ব্বলচিত্ত দুঃখে মুহ্যমান হয়, সুখে উন্মত্ত হয়—কিন্তু রামমোহন দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না। তিনি গৃহ তাড়িত হইয়া নানা কষ্টে পড়িয়া যখন দেশ বিদেশে শত্রু মিত্রের মধ্যে ছিলেন তখন শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট তাঁহাকে শ্রান্ত ক্লান্ত করিতে পারে নাই। আবার সুখের দিনে ও তিনি উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া আপনার জীবনের লক্ষ্য

ভ্রষ্ট হয়েন নাই। অনুকূল বায়ু আর প্রতিকূল বায়ু যাহাই বহিতে থাকুক না—যাহাকে গম্যস্থানে যাইতে হইবে—সে কি কখন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে পারে? হৃদয়ের সঙ্কল্পকে সে ধ্রুব তারার ন্যায়, শয়নে, স্বপনে, নয়নে নয়নে রাখিয়া থাকে। ইহাই সাধকের লক্ষণ।

ভ্রাতৃদ্বয়ের দেহাত্যয়ের পর তিনি সমগ্র পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হওয়ায় তাঁহার আয় যথেষ্ট হইল। তখন তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া অনন্যকর্ম্ম হইয়া ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত হইলেন। এ সময়েও যে তিনি তাঁহার মনোগত হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ব্বিবাদে করিতে পারিয়াছিলেন এ কথা কেহ যেন কখন মনে করেন না। প্রাচীন ও স্থিতিশীল হিন্দু সম্প্রদায় ধর্ম্মসভা ইত্যাকার নাম দিয়া নানা সভা গঠন করিয়া রাজাকে নানা ছন্দে নিন্দা ও তাঁহার কুৎসা রটনা করিতেন। ইহাঁদের অত্যাচারের মাত্রা এত অধিক হইয়াছিল, যে রাজা আত্মরক্ষার জন্য সতত অস্ত্র রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এত নিন্দা ও নির্য্যাতনে তিনি কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। রাজা সাধনভূমে এই সকল বিভীষিকা দর্শন করিয়া সাধন ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সাধনার ফল তাঁহার ভবিষ্য বংশীয়েরা ভোগ করিতেছেন এবং উত্তরকালে আরও অধিকতর ভাবে করিবেন।

প্রজারঞ্জন ও রাজ্যের উন্নতিসাধন—দুটী প্রধান রাজধর্ম্ম। এই রাজ-ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে স্বয়ং উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নিজে অসিদ্ধ হইলে অন্যের উদ্ধার কিরূপে সম্ভব? মহারাজ রামবর্ম্ম এ কথাটী বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং সেই জন্য তিনি জীবনের প্রথম হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রাজা রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয়। ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি মহারাজ রামবর্ম্ম তদীয় রাজ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে আদর্শ রাজা ছিলেন। অশেষ

ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী হইয়াও তিনি আজীবন বিবিধ বিদ্যালোচনায় তৎপর ছিলেন। নূতন জ্ঞান, ও নূতন সত্য সংগ্রহের জন্য মহারাজ চিরজীবন আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সেই সকল শাস্ত্রের জ্ঞানদ্বারা রাজ্যের ও প্রজাবর্গের প্রভূত মঙ্গল করিয়াছেন।

মহারাজ রামবর্ম্মের জীবনের অন্যান্য কীর্ত্তিকাহিনী বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের কথা বলা যাউক। মহারাজ নিত্য অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। প্রত্যূষে তিনি দেওয়ানের নিকট হইতে রাজ্যসংক্রান্ত বহুবিধ কাগজপত্র পাইতেন। সে সমস্ত তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আবশ্যকীয় সংশোধন ও আজ্ঞা দান করিয়া ৭ টার পূর্ব্বেই সে সকল দেওয়ানের নিকট ফিরাইয়া দিতেন। তাহার পর তিনি প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হইতেন। প্রায়ই দেখা যাইত যে এই সময়ে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা আলোচনায় কাটাইতেন। ভ্রমণ করিবার সময় তিনি বহুবিধ লতাপত্র গুল্ম সংগ্রহ করিতেন। মহারাজের স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা ছিল। তিনি আজীবন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। প্রত্যহ স্নানান্তে যথারীতি শাস্ত্রবিহিত পূজা পাঠ সমাপন করিয়া পুনরায় বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ণ বেলা ২টা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিতেন। পরে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত অভ্যাগতগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, সরকারী কার্য্য-বিবরণী শ্রবণাদি কার্য্যে অতিবাহন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। সন্ধ্যার সময় পুনরায় সায়ং সন্ধ্যাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন। পরে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নিজ পাঠাগারে বিবিধ শাস্ত্রালোচনায় রত থাকিতেন। সংক্ষেপতঃ

ইহাই তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী। ইহা ছাড়া নৈমিত্তিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনেক সময় বিশ্রাম সুখ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইত। যাঁহারা মনে মনে ভাবেন, যে অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত ধন জনের অধীশ্বর হইলে, নিরবচ্ছিন্ন বিলাস বিভ্রমে দিন কাটানই সর্ব্বাপেক্ষা জীবনের মহত্তম ও সুখকর কর্ম্ম তাঁহারা মহারাজ রাম বর্ম্মের জীবনী আলোচনা করুন। তাঁহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরে যাইবে।

মহারাজ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই নিজ রাজ্যের জরিপ ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। রাজ্য ও রাজস্বের পরিমাণ সর্ব্ব প্রথমে জানা আবশ্যক। তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময় পর্য্যন্ত রাজস্বের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে সুবন্দোবস্তের গুণে তাঁহার রাজস্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ প্রজার হিতকল্পে কৃষি ও শিল্পের সুবন্দোবস্ত করেন। মহারাজ নিজ রাজ্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের দেশের জমিদারগণের অনুকরণীয়। সাধারণতঃ কৃষক ও শিল্পীগণ স্থিতিশীল। তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে প্রকারে কৃষি ও শিল্প-কার্য্য করিয়া গিয়াছে, তাহা অসুবিধাজনক হইলেও তাহারা তাহাই অনুকরণ করিবে; সহজে নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে বড়ই অনিচ্ছুক। রাজা বা জমিদার সুশিক্ষিত হইলে তিনি অন্যের অপেক্ষা অনেক কম চেষ্টায় আপন প্রজাগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শিল্প ও কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন; নূতন শিল্পের ও শস্যের চাষের প্রচলন করাইতে পারেন। তদ্দ্বারা ধনাগমের নূতন পন্থা হয়। মহারাজ রামবর্ম্ম স্বীয় রাজ্যে টাপিওকা ও কফির চাষ প্রচলিত করিয়া প্রজাগণের নূতন জীবিকার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের ভূমিতে টাপিওকা স্বল্প বা বিনা বৃষ্টিতে প্রচুর

পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। এজন্য অনেকে বলেন এই নূতন খাদ্যদ্রব্যের চাষ প্রচলিত করিয়া মহারাজ রামবর্ম্ম স্বরাজ্যে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তিকে দূরে রাখিয়া গিয়াছেন।

শিল্প সম্বন্ধে তিনি উদার-নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে নিত্য পরিবর্ত্তনপ্রিয় নাগরিকগণের রুচি রাজা ও অন্যান্য ধনী বিলাসিগণের উপর নির্ভর করে। এজন্য তিনি স্বয়ং নিজের শিল্পী প্রজাগণের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। এবং আরও নানা উপায়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার আদর্শ তদীয় রাজ্যের ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিগণ অনুকরণ করিতেন। ইহাতে ত্রিবাঙ্কুরের দেশীয় শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। বাস্তবিক যাঁহারা স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে চাহেন আর যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল কামনা হৃদয়ে পোষণ করেন তাঁহারা যেন মহারাজের আদর্শ অনুকরণ করেন। দেশের ও দশের ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে স্বদেশজাত দ্রব্যের ও শিল্পের আদর করিতে হইবে। স্বদেশী পণ্য ও শিল্পের বহুল প্রচার হইলে প্রজার অবস্থা স্বচ্ছল হইবে, দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে। তাহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল। মহারাজ রামবর্ম্ম অর্থনীতির এই গূঢ়সত্য বিশেষরূপে অবগত ছিলেন এবং তাহা নিজ জীবনে সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজা সর্ব্ব প্রকারে প্রজাগণের হিতকামনা করিতেন। প্রজাসাধারণের জন্য জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা স্বয়ং একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আজীবন বিদ্যালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী হইতে অনেক বিষয় মালয় ভাষায় অনূদিত করিয়া মালয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ রামবর্ম্ম নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাদির অনুষ্ঠান প্রায়ই করিতেন। তিনি বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া যে এরূপ ভাবে রাজ্যের ও প্রজার হিতসাধন করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে। মহারাজের কৃচ্ছ্রসাধন দেখিলে মহাকবি কালিদাসের সহিত একবাক্যে বলিতে ইচ্ছা হয় ঃ—

"প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষেবনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধ স্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যৎকাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্য মুনয়স্তস্মিং স্তপস্যন্ত্যমী॥" (ক)

পর্য্যায়ক্রমে এক্ষণে প্রথিতনামা সচিব স্যর মাধব রাও এবং স্যর সলর জঙ্গের জীবনের সাধনার অংশ বিবৃত করিতেছি। চিরবন্ধুর রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাঁদের সাধনপ্রসঙ্গ অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। অসাধারণ চরিত্রের বল, অদম্য ইচ্ছা না থাকিলে রাজ্য শাসন ও সংস্কার কার্য্যে কৃতী হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। শাসন ও সংস্কার কার্য্য চিরকালই দুরূহ। তীব্র প্রতিবাদ, ভীষণ বাধা এবং দুর্জ্জয় শত্রুশক্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে কেহ প্রকৃত শাসন ও সংস্কার কার্য্যে কৃতী হইতে পারেন না। স্যর মাধব রাও ও স্যর সলর জঙ্গ উভয়েরই অসাধারণ চরিত্রবল ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছিল। সেই জন্যই তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে পদে পদে বাধা

(ক) যে স্থলে কল্পবৃক্ষসমূহ বিদ্যমান, সেই বনস্থলীতে পূজ্যপাদ ঋষিগণ বায়ু ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন কনকপদ্মরেণু দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ সলিলে ধর্ম্মের নিমিত্ত নিত্য স্নানাদি করিতেছেন এবং মণিময় শিলা-পৃষ্ঠে অপ্সরাগণের সন্নিধানে ধ্যান করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অপর মুনিগণ যে স্থান প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করেন ইহাঁরা সেই স্থানে অবস্থান করিয়াও তপস্যা করিতেছেন!

পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হয়েন নাই। এই রাজনীতিবিদ মহাপুরুষদ্বয়কে কি প্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহার আভাস তাঁহাদের দ্বারা শাসিত ও সংস্কৃত রাজ্যগুলির তৎকালীন অবস্থা পাঠ করিলে পাওয়া যায়। প্রথমে স্যর মাধব রাওয়ের প্রসঙ্গ লওয়া যাউক। যখন স্যর মাধবরাও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান পেশকারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন তখন রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। কর্ম্মচারিগণ যথা সময়ে বেতন পান না—রাজ্যের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের জন্য সর্ব্বদা অর্থের অনটন ঘটিত। অগত্যা আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনেক সময়ই ঋণ করিতে হইত। আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কর পর্য্যন্ত বাকী পড়িয়াছিল। সংসারে অর্থ বল মহাবল। অর্থবল হ্রাস হইলে লোকবল হ্রাস হয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহারা সময়ে বেতন না পাওয়াতে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিতেন এবং রাজকার্য্যে তাচ্ছিল্য করিতেন। আবার যাঁহাদের ক্ষমতা ছিল তাঁহারা উৎকোচগ্রাহী ছিলেন। সুতরাং রাজা আপনার লোকজনের নিকট হইতে রীতিমত কাজ পাইতেন না। আপন কর্ম্মচারিগণ গৃহশত্রুতে পরিণত হইতে লাগিলেন। অপর দিকে বহিঃ শত্রুগণও প্রবল হইতে লাগিল। তখন রাজ্যের সীমানা প্রদেশে প্রায়ই বিদ্রোহ ঘটিত। রাজ্যের মধ্যেও প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। চৌর্য্য ও দস্যুতার সম্বাদ নিত্য শুনা যাইত।

কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা রাজ্যের ধনাগম হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের ভূমি কৃষির পক্ষে অনুকূল হইলেও তখন কৃষিকার্য্য সুন্দররূপে হইত না। পথ ঘাট ভাল না থাকায় পণ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানি অল্প হইত। আবার যাহা হইত, রাজার অর্থাভাবহেতু তাহার উপর অত্য-

ধিক শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল। সুতরাং কি অন্তর্বাণিজ্য আর কি বহির্বাণিজ্য কোনটীর অবস্থা ভাল ছিল না। অন্যান্য দিকেও রাজ্যের অবস্থা তথৈবচ ছিল। রাজ্যের এই দুর্দ্দশার কথা যথাসময়ে তদানীন্তন গভর্ণর জেনেরল লর্ড ড্যালহৌসীর কর্ণগোচর হয়। তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ব্রিটিশ রাজভুক্ত করিবার মানসে উতকামন্দ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এমন সময়ে মাধব রাও মধ্যবর্ত্তী হইয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং রাজ্যের আমূল সংস্কারের জন্য সাত বৎসর সময় চাহেন। সৌভাগ্যবশতঃ মন্ত্রী মাধব রাওয়ের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়।

এই সময় হইতে মাধব রাওয়ের সাধনার কঠোরতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুরাতন পদস্থ কর্ম্মচারীরা প্রায় স্থিতিশীল হইয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রায় সর্ব্ব প্রকার সংস্কার বিরোধী। মাধবরাও যেমন এক দিকে রাজ্যের মঙ্গলার্থে সর্ব্ব বিষয়ে সংস্কার প্রয়াসী, পুরাতন কর্ম্মচারিবর্গ তেমনই সংস্কারবিদ্বেষী। মাধবরাও প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিবাদ পাইতে লাগিলেন। মাধব রাওয়ের চরিত্রবল অনন্যসাধারণ ছিল অন্যথা এইরূপ প্রতিবাদের মধ্যে কার্য্য করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইত। গৃহসংস্কারে ত এইরূপ বিঘ্ন বাধা। অপর দিকে প্রতিবাদও কম নহে। অনেক অনুগৃহীত ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ পণ্যের একচেটিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। এখন একে একে তাঁহাদের একাধিপত্য রহিত হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহারা চারিদিকে নূতন সচিবের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। পুরাতন পদস্থ কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্বের মত যথেচ্ছভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন না। অনেক স্থলে তাঁহাদের অবৈধ ধনাগমের পথ রুদ্ধ হইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহারা সকলে স্যর মাধব রাওয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপে স্বার্থপরতা ও অন্যান্য নানা দুরভিসন্ধি আরোপ করিতে লাগিলেন। স্যর মাধব রাও নিজের চরিত্র

নিজে বেশ জানিতেন। নিজের বিচারে তিনি নিষ্কলঙ্ক ও রাজভক্ত ছিলেন। সুতরাং অন্যের নিন্দা বা সুখ্যাতিতে তিনি কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই। সেই জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে—সাধনভূমিতে—তাঁহার চরিত্র আদর্শস্থানীয়। এত দিন শত্রুপক্ষ তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যে বাধা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে এখন তাঁহারা অন্য উপায়ে আপনাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবার তাঁহারা ভেদ নীতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা মহারাজ ও মন্ত্রী মহোদয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইয়া দিলেন। এইরূপ অবস্থায় স্যর মাধবরাও মহারাজের কর্ম্ম করা প্রীতিকর বিবেচনা করিলেন না। অতঃপর তিনি মাসিক সহস্র মুদ্রা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর স্যর মাধব রাও অবশিষ্ট জীবন সাহিত্য ও ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহন করিবেন এইরূপ বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে তিনি হোলকারের রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন। হোলকারের রাজকার্য্যে তিনি দুই বৎসর মাত্র ব্যাপৃত ছিলেন।

হোলকারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুনরায় অনুরুদ্ধ হইয়া ১৮৭৫ সালে বরোদা রাজ্যের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করিলেন।

বরোদায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বড়ই বিপদ ও বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। মলহররাও রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র ভীতি ও অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে। লোকে কেহ কাহাকেও সহজে বিশ্বাস করে না। দশ বিশ জন লোক মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিদ্রোহ, লুঠ তরাজ ও রাজশক্তিকে উপেক্ষা করাই এই সকল দলের প্রধান কর্ম্ম। প্রজা সাধারণের এই অবস্থা। প্রজার

মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। প্রজার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, সুতরাং রাজার অবস্থা যে ততোধিক হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? শূন্য রাজকোষ, বিদ্রোহী ও অবিশ্বাসী প্রজা লইয়া রাজ্যের সুশাসন অসম্ভব হইয়াছিল। সুশাসন ও সংস্কার কার্য্যের জন্য অর্থের আবশ্যক। অন্যথা সুশাসন ও সংস্কার দুরূহ হইয়া উঠে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কর্ম্মচারিগণ অল্প বেতনভোগী। সেই অল্প বেতনও আবার বহু দিন হইতে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং তাহারা যে উৎকোচগ্রাহী ও অত্যাচারী হইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এক্ষণে এই অবস্থার সংস্কার করিতে হইলে কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যাহারা দুর্বৃত্ত তাহাদিগকে বাকী বেতনাদি দিয়া বিদায় করা আবশ্যক। তাহার পর উৎকোচাদি নিবারণ করিতে হইলে কর্ম্মচারিসাধারণের কর্ত্তব্য কার্য্যের দায়িত্বের অনুপাতে বেতন বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক এবং বর্দ্ধিত হারের বেতন যথা সময়ে দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর যে সকল কুসীদগ্রাহী লোক ঋণ দিয়া রাজাকে বাধ্য রাখিয়াছে এবং সেই জন্য বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধের অপব্যবহার করে তাহাদের ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। এখন দেখা যাইতেছে এ সকল কার্য্যই অর্থসাপেক্ষ। কিন্তু এই সকল কার্য্যের জন্য তখন রাজকোষে অর্থ ছিল না। তখন যেরূপ আয় ছিল তাহাতে রাজ্যের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় কোনরূপে চলিত। অথচ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সংস্কার আবশ্যক। আর সংস্কারের জন্য অর্থের আবশ্যক। কিন্তু এজন্য অর্থ আসে কোথা হইতে? রাজ্যের সুশাসন, সংস্কার ও রাজস্ব বৃদ্ধির প্রশ্ন প্রথম হইতেই স্যর মাধব রাওকে সাতিশয় চিন্তিত করিয়াছিল। সুশাসন ও সংস্কার কার্য্য রাজ্যের রাজস্বের উপর নির্ভর করে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে কি প্রকৃষ্ট উপায়ে সেই রাজস্ব

বৃদ্ধি হয় তাহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। গাইকোয়ারের রাজ্যের রাজস্ব-প্রণালী নানা দোষে দুষ্ট ছিল। রাজস্বপ্রণালীর সংস্কারের জন্য নূতন দেওয়ানকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। রাজস্বের উন্নতির জন্য স্যর মাধবরাওকে যে কি পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা বুঝিতে হইলে বরোদার সেই সময়ের রাজস্ব প্রণালীর সম্বন্ধে দু চারিটী কথা বলা আবশ্যক।

বরোদায় সর্দ্দার উপাধিধারী কতকগুলি অভিজাতের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। ইহাঁরা রাজ সরকারের নিকট হইতে কয়েক বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ দিবার সর্ত্তে জমিদারী ইজারা লই-তেন। সর্দ্দারগণ আবার ঐ সকল জমিদারী সওকার নামক এক শ্রেণীর লোকের হাতে পত্তনী দিতেন। ইহাঁরা কেবল সর্দ্দারের প্রাপ্য টাকা দিবার জন্য বাধ্য থাকিতেন মাত্র অথচ অন্য কোন নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেন না। নানা হিসাবে টাকা আদায় করিবার জন্য সওকার-গণ প্রজাপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কথা হইতেছে, ঠিকাদারী বন্দোবস্তে কেহ কাহার প্রতি তাকায় না। প্রত্যেকেই আপন আপন দেয় ও প্রাপ্য লইয়া ব্যস্ত। রাজা, সর্দ্দার সওকার বা প্রজার সুবিধা অসুবিধা বুঝিবেন না। তিনি সর্দ্দারের নিকট হইতে আপন প্রাপ্য টাকা পাইলেই নিশ্চিন্ত; সর্দ্দার আবার সেইরূপ সওকারের নিকট আপন প্রাপ্য টাকা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চাহেন। রাজা বা সর্দ্দার কাহাকেও সাক্ষাৎভাবে প্রজার সহিত কার্য্য করিতে হইত না সুতরাং প্রজার সুখ দুঃখে তাঁহারা উদাসীন থাকিতে পারিতেন। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি বা সুবৃষ্টিজনিত প্রজার ক্ষতি বৃদ্ধির কথা তাঁহারা জানিতে চাহিতেন না। তাঁহারা আপন আপন প্রাপ্য টাকা চাহেন। এ দিকে সওকারকে ঐ টাকা এক একটী করিয়া প্রজার নিকট হইতে আদায়

করিতে হইত। সওকার আদায়ের টাকা হইতে নিজের লাভ রাখিয়া তবে সর্দ্দারকে দিতেন। ন্যায্য লাভের কথা ছাড়া সওকার ভাবিতেন যে, কি জানি, ঠিকা পুনরায় পাইব কি না সুতরাং এই কয় বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায় তাহাই ভাল। তিনি এই ভাবিয়া প্রজার নিকট বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্থ শোষণ করিতেন। ইহাতে প্রজা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইত এমন কি অনেক সময় উৎখাত হইত। সুতরাং এই অবস্থায় প্রজার দুঃখ কখনও ঘুচিত না। রাজার মঙ্গলে যেমন প্রজার মঙ্গল তেমনি প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। অতএব যে রাজ্যে প্রজা দুঃখে দিন যাপন করে সে রাজ্যের শ্রেয়ঃ কোথায়? মাধবরাও সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝিলেন। কুশলী অস্ত্রচিকিৎসক যেমন পীড়িত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া কোথায় ব্রণস্থান নির্দ্দেশ করেন এবং কোথায় ছুরিকাঘাত করিতে হইবে জানিতে পারেন মাধবরাও তেমনই রাজ্যের ব্রণস্থান কোথায় এবং কোথায় সংস্কারকের তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রয়োগ করিতে হইবে জানিতে পারিলেন। সর্দ্দারগণের সহিত রাজস্বের ঠিকাদারী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিতে না পারিলে রাজ্যের কল্যাণ নাই এ কথা তিনি উত্তমরূপে বুঝিলেন। কিন্তু সর্দ্দারগণকে বিপর্য্যস্ত করা বড়ই সুকঠিন কার্য্য। তাঁহারা রাজ্যের অভিজাত। তাঁহাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সওকারগণ তাঁহাদের সহায়ক। মাধবরাও ইহাঁদের হস্ত হইতে রাজস্ব সংগ্রহের ভার উঠাইয়া লইয়া তৎসঙ্গে তাঁহাদের ধনাগমের পথ রুদ্ধ করিতেছেন এ কথা যখন সকলে জানিতে পারিলেন তখন চারিদিক হইতে ভীষণ প্রতিবাদ পাইতে লাগিলেন। সর্দ্দারগণ, কূটবুদ্ধিব্যবহার-বিশারদগণের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা নানাপ্রকার আইনের তর্ক উঠাইতে লাগিলেন। স্যর মাধবরাও ব্যবহারাজীব না হইয়াও ব্যবহার

শাস্ত্রের কূটতত্ত্ব সকল অবগত ছিলেন। তাহার পর তাঁহার স্বাভাবিক কুশাগ্র বুদ্ধির সাহায্যে কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের উপায় করিলেন। সর্দ্দারগণ যে সকল দলিলাদির সাহায্যে আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে উদ্যত ছিলেন তাঁহারা সেই সকল দলিলের সর্ত্ত পুরণ না করাতে নিজের জালে নিজেরা পড়িলেন। তাঁহাদের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যে সকল গ্রাম বিলি হইত তাহার প্রধান সর্ত্ত যে তাঁহারা প্রতি বৎসর নিয়মিত সময়ে আপন আপন দেয় টাকা পরিশোধ করিবেন। কিন্তু এই বিবাদের সময় হিসাব পরীক্ষা করিয়া স্যর মাধবরাও দেখিলেন অধিকাংশ সর্দ্দারের নিকট কোন না কোন হিসাবে রাজস্ব অনাদায় রহিয়াছে। এইরূপ অনাদায় টাকার পরিমাণও অনেক। স্যর মাধবরাও এই সব দেখিয়া এই ঘোষণা করিলেন যে, যে যে সর্দ্দারের নিকট রাজস্ব বাকী আছে তাঁহারা যদি নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে টাকা না দিতে পারেন তবে তাঁহারা স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। সর্দ্দারগণ এত দিন বেশ সুখে কাটাইতেছিলেন—তাঁহাদের ব্যয়ের কোন সীমা ছিল না—রাজার প্রাপ্য অর্থ পর্য্যন্ত খরচ করিয়াছেন। ইহঁাদের নিকট যে সঞ্চিত অর্থ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাঁহারা নূতন দেওয়ানের এইরূপ ঘোষণা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। অনেকেই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দেয় টাকা দিতে পারিলেন না। সচিব স্যর মাধবরাও যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। সর্দ্দারগণ শেষে পরাজিত হইলেন। ক্রমে সওকারগণও ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। সর্দ্দার ও সওকারদিগের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় ছিলেন তাঁহাদিগকে কাশী প্রভৃতি স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া তিনি দেশে শান্তি স্থাপন করেন। স্যর মাধব অতঃপর আপনার মনোমত সংস্কার কার্য্য করিতে লাগিলেন। শাসন ও রাজস্ব উভয় বিভাগেই তিনি বিবিধ হিতকর সংস্কার করেন। সর্দ্দার

ও সওকারদিগের হস্ত হইতে রাজস্ব সংগ্রহের ভার উঠাইয়া লইয়া সঙ্গত উপায়ে ও সংস্কৃত পদ্ধতিতে রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে হইলে, আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ এই দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কেবল আয় বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হইলে করভার বৃদ্ধির ভয় থাকে ও অন্যান্য প্রকারে প্রজা শোষণের আশঙ্কা থাকে। সেই জন্য রাজস্বতত্ত্ববিদ সচিব ব্যয় সংকোচ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন। স্যর মাধবরাও বরোদা রাজ্যের অনেক অপব্যয় রহিত করেন। তন্মধ্যে হাব্সী সৈন্যদল উঠাইয়া দেওয়া একটী প্রধান। ইহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল—তাহার উপর ইঁহাদের অত্যাচারও কম ছিল না। এই সকল কারণে তিনি এই সৈন্যদল রক্ষা করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই।

সচিব মাধবরাও রাজ্যের উন্নতিকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেওয়ানের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অবিরাম চেষ্টা দ্বারা এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের কৃপায় তিনি সাধনভূমিতে বিঘ্নমুক্ত হয়েন। তিনি যে যে কার্য্যের সাধনায় এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন ক্রমে ক্রমে সেই সেই কার্য্যে তাঁহার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা হইতে লাগিল। স্যর মাধব রাওয়ের কর্ম্মশীল জীবনে রাজনীতিক্ষেত্রে সাধনার প্রসঙ্গ এই খানেই এক প্রকার শেষ হয়।

স্যর সলরজঙ্গ ২৪ বৎসর বয়সে নিজামের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পাশ্চাত্য জ্ঞানসম্পদে হিন্দুসচিব মাধবরাওয়ের ন্যায় স্যর সলরজঙ্গ সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। অল্প বয়সে রাজকার্য্যে সমধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের অল্পতা জন্য তাঁহাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি ঈশ্বরদত্ত

ক্ষুরধার বুদ্ধি, অনবদ্য স্বাস্থ্য ও দৃঢ়চিত্ত লইয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

স্যর সলরজঙ্গ মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অল্পকাল পরে দেখিলেন রাজ্যের মধ্যে নানা গোলযোগ। রাজকোষ শূন্য। নিজামের বহুমূল্য রত্নরাজি ঋণের জন্য বিলাতে আবদ্ধ। এই সময়ে নিজামের তিন কোটী টাকা ঋণ। সৈনিক কর্ম্মচারিগণের বাকী বেতনের জন্য অনেক গ্রামের রাজস্ব তাঁহাদের নিকট আবদ্ধ। নিজামের প্রতিপত্তি কোথাও নাই। কেহ তাঁহাকে ঋণ দিতে সাহস করেন না। এদিকে রাজ্যের যাহা আয় ছিল তাহাতে ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। ব্যয়ও যে নির্দ্ধারিত বা ন্যায্য ছিল তাহা নহে। নিজামের অনেক কুপোষ্য ছিল। তাঁহাকে অনেক গলগ্রহের ভার বহন করিতে হইত।

সলরজঙ্গ রাজ্যের অবস্থা বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দেখিলেন রাজ্যের মধ্যে কতকগুলা অকর্ম্মণ্য অথচ অত্যাচারী আরবী পাঠান ও রোহিলা সৈন্য রহিয়াছে। যুদ্ধকার্য্যে ইহাদের সামর্থ্য না থাকিলেও অত্যাচারে ইহারা বিশেষ অভ্যস্ত। ইহাদের অনেকে সাক্ষাৎভাবে নিজামের অধীনে থাকিয়া বেতন পাইত। এবং অপরাপর অনেকে জায়গীরদার ও তালুকদারদিগের অধীনে থাকিত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহাঁদের এই সকল সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবার কথা। স্যর সলরজঙ্গ দেখিলেন ইহাদের বেতনাদিতে বহু ব্যয়। অথচ ইহাদের দ্বারা রাজ্যের উপকারের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি ইহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন এবং এতদর্থে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। যাহারা সাক্ষাৎভাবে নিজামের অধীন ছিলেন তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত

হইলেন না ; অধিকন্তু প্রত্যেক জায়গীরদার ও তালুকদারের উপর ঐ মর্ম্মে আদেশ দিলেন। এই সকল সৈনিকদিগের কর্ম্মচ্যুতিতে রাজ্যের ত্রিবিধ মঙ্গল হইল। প্রথমতঃ ইহাদের বেতনের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইত তাহা বন্ধ হইল। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের অনেকের নিকট বাকী বেতন ও অন্যান্য নানা কারণে অনেক গ্রামের রাজস্ব আবদ্ধ ছিল—তাহা উদ্ধার হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে এই উপায়ে তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি করেন এবং তৃতীয়তঃ প্রজাসাধারণ ও নাগরিকগণকে ইহাদের পাশবিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন।

স্যর সলরজঙ্গ ইহার পর রাজ্যের জরিপ করিয়া হায়দ্রাবাদকে বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য যে ঠিকাদারী বন্দোবস্ত ছিল তাহা উঠাইয়া দিলেন। তালুকদারগণ নানা প্রকারে প্রজাপীড়ন করিতেন। এজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ হইত। তাঁহাদের অত্যচারের কথা ছাড়া তাঁহাদের নামে আরও গুরুতর অভিযোগ এই ছিল যে তাঁহারা রাজস্ব আদায় করিয়া তাহার চতুর্থাংশ কোথাও বা অর্দ্ধেক হিসাবে পারিশ্রমিক পূর্ব্বেই কাটিয়া লইতেন। ইহাতে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হইত। এই সকল কারণে মন্ত্রী সলরজঙ্গ তাঁহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিলেন। এক্ষণে তিনি প্রজা হিতার্থে নূতন নিয়ম করিলেন। প্রজার দেয় খাজানা নির্দ্দিষ্ট হইল। এবং তিনি শস্যের পরিবর্ত্তে নগদ টাকায় খাজানা লইবার প্রথা করিলেন। প্রজার স্বত্বের যদি স্থায়িত্ব না থাকে, তাহার দেয় করের যদি কোন নির্দ্ধারণ না থাকে, তবে সে কোন লাভের আশায় নিজ আবাদী জমির উন্নতি করিবে ? সে যদি দেখে তাহার চেষ্টার ফলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সহিত খাজানা বৃদ্ধি হয় আর বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে অপারক হইলে বা অস্বীকার

করিলে জমি হস্তান্তরিত হয় তবে কোন লাভের প্রত্যাশায় দেহপাত করিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবে? কিন্তু সে যদি এরূপ অভয় পায় ও বিশ্বাস করে যে জমি ভাল করিলে তাহাতে শস্য প্রচুর হইলেও রাজা খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না, তবে না, সে লাভের আশায় দেহপাত করিয়া জমির উন্নতি করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। প্রজার দ্বারাই ঊষর ভূমি উর্ব্বর হয়, দেশ শস্যশ্যামলা হয়। প্রজা সুখী হইলে রাজা সুখী হয়েন। প্রজার ধন বৃদ্ধি হইলে রাজার ধন বৃদ্ধি হয়। যে রাজ্যের প্রজার অবস্থা সচ্ছল সে রাজ্যে রাজার বহুবিধ ধনাগমের পথ আছে। প্রজার অবস্থা সচ্ছল হইলে রাজা প্রত্যক্ষ ও গৌণভাবে নানাপ্রকার শুল্ক দ্বারা রাজকোষ পূর্ণ করিতে পারেন। স্যর সলরজঙ্গ রাজস্বতত্ত্বের এই গূঢ়তত্ত্ব অবগত ছিলেন—ইহার উপকারিতায় আস্থাবান ছিলেন—সেই জন্য তিনি নানা অসুবিধা ও প্রতিবাদের মধ্যে ঐ প্রকার সঙ্গত ও সুন্দর রাজস্ব প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। এখানে এ কথা বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে এই প্রজাসত্ত্ববিষয়ক আইনের জন্য বঙ্গদেশের প্রজাসাধারণের অবস্থা ভাল।

স্যর সলরজঙ্গের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের আর্থিক অবস্থার ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। এখন তিনি একটী মধ্যবর্ত্তী ধনাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজ্যের আয় ব্যয় তথা হইতে হইত এবং সমস্ত জমা খরচের হিসাব নিকাশ সেখানে হইত। ইহাতে দেখা যায় স্যর সলরজঙ্গের সংস্কৃত রাজস্ব পদ্ধতিতে রাজ্যের ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হইতে লাগিল। ধনাগারে অল্পে অল্পে ধন সঞ্চিত হইতে লাগিল।

কথিত আছে:—

নরপতি-হিতকর্ত্তা দ্বেষ্যতাং যতিলোকে,

জনপদহিতকর্ত্তা ত্যজ্যতে পার্থিবেন।
ইতি মহতি বিরোধে বিদ্যমানে সমানে,
নৃপতি জনপদানাং দুর্লভঃ কার্য্যকর্ত্তা।”

অর্থাৎ রাজা ও প্রজা উভয়কে সন্তুষ্ট করিয়া কার্য্য করা দুরূহ, রাজার ভাল করিতে গেলে প্রজা বিরূপ হয়, আবার প্রজার হিতার্থে কার্য্য করিতে গেলে রাজা রুষ্ট হয়েন সুতরাং রাজা ও প্রজা উভয়েরই হিতসাধন করিতে পারেন এমন লোক দুর্লভ। কথাটী খুব সত্য। কিন্তু যিনি রাজা এবং প্রজা উভয়েরই বিরাগভাজন হইয়াও কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে দেশের কল্যাণ হৃদয়ে পোষণ করিয়া, ভগবানের কৃপায় ভরসা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তেমন লোক জগতে নিশ্চয়ই আরও দুর্লভ।

স্যর সলর জঙ্গ এইরূপ দুর্লভ ব্যক্তি ছিলেন। নিজাম আফজল উল দৌল্লা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। মন্ত্রী মহোদয়ের কার্য্য-কলাপ এবং তাঁহার গতিবিধি নিজাম সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্তে দেখিতেন। স্যর সলরজঙ্গ রাজ্যের প্রধান সচিব হইলেও তিনি নিজামের নজরবন্দী থাকিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ নিজামের বিনা অনুমতিতে তিনি কুত্রাপি গতায়াত করিতে পারিতেন না। নগরের উপকণ্ঠে তাঁহার পুষ্পবাটিকায় বন্ধু বান্ধব লইয়া একদিন আমোদ প্রমোদে সায়াহ্ন অতিবাহিত করিবার বাসনা হইলে, তাহার জন্য, সচিবকে নিজামের অনুমতি লইতে হইত। কোন দিন ইংরাজ সৈনিকের কুচ কাওয়াজ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে প্রভুর আজ্ঞা লইতে হইত। নিজাম তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন না। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে এরূপ ভাব অতিশয় শোচনীয়। স্যর সলর জঙ্গকে পদচ্যুত করিবার জন্য একবার একটী বিষম ষড়যন্ত্র হয়।

ষড়যন্ত্রকারিগণ নিজামকে এরূপভাবে সংবাদ দেয়, যে, রেসিডেণ্ট সাহেব মন্ত্রী মহোদয়ের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। নিজাম সলর জঙ্গের উপর এতই রুষ্ট ছিলেন যে তিনি এ সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া একবারে রেসিডেণ্ট সাহেবের কুঠীতে গিয়া কথোপকথনচ্ছলে বলেন যে—রেসিডেণ্ট সাহেব সচিবকে কৰ্ম্মচ্যুত করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি তাহা অনুমোদন করিবেন। রেসিডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বাপর সলর-জঙ্গের পরম মিত্র ছিলেন। তিনি নিজামের মুখে এই কথা শুনিয়া মনের ভাব গোপন করিয়া, মনে মনে আশ্চর্য্য হইলেন। যে রাজার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করিয়া তিনি পরিশ্রম করিতেছিলেন তাঁহার ত মনের ভাব এই প্রকার। এক্ষণে দেখা যাউক তিনি প্রজাবর্গের কিরূপ অনুরাগভাজন ছিলেন।

স্যর সলরজঙ্গ চিরকাল ইংরাজের অকৃত্রিম মিত্র। সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী ইংরাজরাজের মিত্রতায় যে, হায়দ্রাবাদের পরম মঙ্গল ইহা তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। এবং তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ যখন ভারতের চারিদিকে বিদ্রোহানল জ্বলিতেছিল, যখন এক রাজার পর অপর রাজা বিদ্রোহীদলের সহিত যোগ দিতে ছিল—যখন একদল সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া অপর দলকে বিদ্রোহ ব্যাপারে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছিল—যখন বিদ্রোহ-বহ্নিতে ইংরাজ নরনারী ও অসহায় বালক বালিকাগণ দাবানল বেষ্টিত মৃগযূথের ন্যায় ভীতিবিহ্বল হইয়া দিনযাপন করিতেছিলেন তখন শত্রু মিত্র সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া নিজামের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে-ছিলেন। নিজামের প্রজাবর্গ "ফিরীঙ্গি"দিগকে "হিন্দুস্তান" হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে—নিজামের আজ্ঞামাত্র তাহারা অপেক্ষা করিতেছে—ইঙ্গিতে তাহারা নিজামের অনুমতি পাইলে

বিদ্রোহীদলের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিসবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করে— এরূপ উৎকণ্ঠা ও উন্মত্ততার সময় একমাত্র দূরদর্শী রাজনীতিক স্যর সলরজঙ্গের দৃঢ়চিত্ততার গুণে সকল দিক রক্ষা হইয়াছিল। তিনি নিজামের সৈন্য ও প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহব্যাপারে যোগ দিতে নিরস্ত করিলেন। সৈন্যগণ ও প্রজাগণ নিরস্ত হইল সত্য। কিন্তু তিনি কৌশল দ্বারা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত নিবারণ করিলেন মাত্র। সে অগ্নি পরে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু তৎকালে মাঝে মাঝে সে অগ্নির অল্পাধিক উৎপাত দেখা গিয়াছিল। ইহার নিদর্শন স্বরূপ দুইবার তাঁহার জীবন শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় দুইবারই তিনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে স্যর সলরজঙ্গ প্রজাগণকে বিদ্রোহে লিপ্ত হইতে না দিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা আত্মজীবন বিপদাপন্ন করেন। সিপাহীবিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৯ খৃঃ অঃ হায়দ্রাবাদের লোকেরা যথারীতি চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য উদ্যোগ করে। এক দিন সচিব মহোদয় রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে নিজামের প্রাসাদ হইতে যখন ফিরিতেছিলেন তখন জাহাঙ্গীর খাঁ নামক একজন লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোড়ে। সৌভাগ্য বশতঃ দুর্বৃত্তের সন্ধান ব্যর্থ হয়। বন্দুকের সন্ধান ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে তরবারি হস্তে সলরজঙ্গের প্রতি ধাবিত হইল। কিন্তু সে বারও সে কিছু করিতে পারিল না। সলরজঙ্গের পার্শ্বস্থ অপরাপর লোকজন পাষণ্ড জাহাঙ্গীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

এই দুর্ঘটনার বহুদিন পরে ১৮৬৮ সালে স্যর সলরজঙ্গকে হত্যা করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা হয়। একদিন নিজামের প্রাসাদে দরবারে যাইবার সময় পথিমধ্যে জনৈক দুরাত্মা তাঁহাকে লক্ষ্য

করিয়া দুইবার বন্দুক আওয়াজ করে। দুইবারই পাষণ্ডের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। পরে সে স্বয়ং ধৃত হইয়া নিজামের সম্মুখে বিচারার্থ নীত হয়। নিজাম তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। স্যর সলরজঙ্গ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার পরম শত্রুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করাইয়া কারাদণ্ডের জন্য নিজামকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিজাম দুর্বৃত্তের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন নাই। স্যর সলরজঙ্গ রাজার মঙ্গলের জন্য আপনার সুখ স্বাস্থ্য এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার তিনি প্রীতির পাত্র হইতে পারেন নাই। অপরত্র প্রজাহিতার্থে তাঁহার চেষ্টা দ্বারা তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের পূজার পাত্রও হইতে পারেন নাই, প্রজাগণের তিনি অনুরাগ লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি কি রাজা কি প্রজা উভয়েরই সতত মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি উভয় কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় স্থিরচিত্তে যে মহাপুরুষ কর্ত্তব্যের পথে অবিচলিত থাকিতে পারেন তিনি অসাধারণ লোক। তাঁহার সদৃশ ব্যক্তি যে নিতান্ত দুর্লভ তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

১৮৬৯ খৃঃ অঃ বৃদ্ধ নিজাম আফজল উল দৌল্লার মৃত্যুর পর নবীন নিজাম সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। কিন্তু তিনি তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিধায় গভর্ণর জেনেরল বাহাদুর স্যর সলরজঙ্গ এবং সামস্‌উল্ মুল্ক আমির ই কবীরকে নবীন নিজামের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। স্যর সলরজঙ্গ পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যমের সহিত রাজ্যের হিতসাধনে রত রহিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। পরে ১৮৭৫ খৃঃঅঃ আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড (তখন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স নামে খ্যাত ছিলেন) ভারত ভ্রমণে আসেন। এই সময় স্যর সলরজঙ্গ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এবং তাঁহারই সাদর আহ্বানে সলরজঙ্গ ১৮৭৬ সালে ইংলণ্ড

যাত্রা করেন। সেখানেও তিনি বিবিধ উপায়ে নিজামও তাঁহার রাজ্যের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি স্বদেশে কি বিদেশে তিনি কায়মনোবাক্যে হায়দ্রাবাদের হিত সাধন করিয়াছিলেন। রাজনীতিজ্ঞ স্যর সলরজঙ্গের সাধনপ্রসঙ্গ চিরকাল মনোজ্ঞ এবং হিতকর বলিয়া পরিগণিত হইবে।

নৃপতি বা নৃপকল্প ব্যক্তি, ধনী বা অভিজাত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সদিচ্ছা সম্পন্ন হইলে যেমন ধন,মান,বিষয় বিভব বা বিলাস বিভ্রম কিছুই তাঁহার ঈপ্সিত বস্তু লাভের পথে অন্তরায় হইতে পারে না—মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি যেমন কোনরূপে তাঁহাকে সাধনার আসন হইতে বিচলিত করিতে পারে না সেইরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইলে সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে, প্রতিজ্ঞা অটল থাকিলে সমাজের দরিদ্র দুঃস্থ নগণ্য ব্যক্তিও দুঃখ, দারিদ্র্য অভাব, অনটন, অর্দ্ধাশন বা অনশন অথবা রোগ, শোক যাহা কিছু দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক, সমস্তই অতিক্রম করিয়া সাধনভূমিতে নির্ভীক চিত্তে থাকিতে পারেন। ধনবল বা জনবল না থাকিলেও তিনি নিজের চরিত্রবলে এবং প্রতিজ্ঞার বলে, আত্মশক্তি দ্বারা সর্ব্ব প্রকার প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি প্রতিকূল শক্তি সমূহের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইবেন সেও স্বীকার তথাপি সাধনভূমি ত্যাগ করিবেন না। দুঃখ দারিদ্র্যের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভীতিবিহ্বল হয়েন না। তিনি কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষতা প্রকাশ করেন না। বিত্তবিহীন হইলেও তিনি শক্তিহীন নহেন। কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তি বীরপুরুষ বলিয়া চিরকাল বরণীয়। বঙ্গের গৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্রেণীর বীরপুরুষদের মধ্যে একজন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন কর্ম্মযোগী ছিলেন।

বিদ্যামন্দিরে তাঁহার কর্ম্মযোগের সাধনার সূচনা হয়। বাল্যে যখন বিদ্যামন্দিরে বাগ্‌দেবী সাধনায় রত থাকেন তখন দারিদ্র্য নানাভাবে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে লাগিল। নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। কিন্তু বালক ঈশ্বরচন্দ্র স্বীয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় সাহায্যে সে সকলকে পরাভূত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রজীবনে যে প্রকার কষ্ট ও সহিষ্ণুতার সহিত নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে বিস্ময় ও প্রশংসার ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। একদিকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম অপর দিকে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সম্যক চেষ্টা, বৈদিশিক অনেক মহাত্মার জীবনে দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিণ দেশীয় যুক্ত রাজ্যের প্রথিতনামা দেশপতি মহাত্মা গারফীল্‌ডের জীবনে এই প্রকার ঘটনা সমাবেশ দেখা যায়। দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও অবশ্য সেরূপ উদাহরণ বিরল ছিল না। উদ্দালক ও উপমন্যুর কথা এখন পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন দেশে দৈহিক পরিশ্রমের মর্য্যাদা নাই। কায়িক শ্রমের বিনিময়ে মানসিক উন্নতি লাভের প্রবৃত্তি প্রশংসার কথা। যে দিন লোকের সে প্রবৃত্তি হইবে সে দিন হইতে আমাদের দেশের মঙ্গলের সূত্রপাত হইবে। শ্রমজীবিগণের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিস্তার হইবে। যাহা হউক সে ত দূরের কথা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র যখন প্রথমে কলিকাতায় আসেন তখন তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া পরে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। তখনকার সময়ে কলিকাতায় বাস, তাহার উপর স্বহস্তে তিন চারি জনের রন্ধনাদি কার্য্য এবং পরে ক্লান্ত শরীরে রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যে কত

দূর কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

তখন কলিকাতা সহর কেমন ছিল তাহার সম্বন্ধে দুচারি কথা বলিলেই কলিকাতা বাসের সুখের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। কলিকাতা তখন এমন সৌধমালায় শোভিত ছিল না। রাত্রিতে আলোকরাজিতে শোভিত হইত না। সৌদামিনী চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া কমলার আলয় সুন্দর সৌধশ্রেণীর শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে এ কথা তখন কেহ শুনে নাই। জাহ্নবীর পূত জলই লোকে জানিত, পল্‌তায় যে তাহা পরিষ্কৃত হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বা গৃহাভ্যন্তরে পাওয়া যাইতে পারে তাহা কেহ ভাবিতে পারিত না। পরিষ্কৃত কলের জল, গ্যাসের ও বিদ্যুতের আলোক ত অপেক্ষাকৃত বিলাসের কথা। কিন্তু আজ কাল আমরা যে গুলিকে স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি সে গুলির পর্য্যন্ত তখন অভাব ছিল। পরিষ্কৃত পয়ঃপ্রণালী বা আবর্জ্জনাশূন্য পথ ঘাট তখন ছিল না। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাহায্যে এখন মিউনিসিপালিটী কলিকাতার সমূহ উন্নতি করিয়াছে। তখন সে সব প্রায় কিছুই ছিল না। প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে পঙ্কিল পূতিগন্ধময় পয়ঃপ্রণালী সকল অনাবৃত থাকিত। নগরের অধিকাংশ আবর্জ্জনা শেষে সেইখানে পচিত এবং সেগুলি হইতে সতত হৃৎকারজনক দুর্গন্ধ নির্গত হইত। পথের মধ্যে স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত। রাত্রিতে পথে কদাচিৎ আলোক দেওয়া হইত—যদিও বা কোথাও দেওয়া হইত তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইত এবং তাহাতে কেবল অন্ধকার ঘনীভূত হইত মাত্র। বাটীর বাহিরে পথ ঘাটের ত এই দশা। ভিতরে, দ্বিতল বা ত্রিতল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণ হইতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা শূন্যোদক গভীর কূপ বলিয়া বোধ হইত। এইসকল বাটীর

অধিকাংশ ভাড়াটিয়া দ্বারা পূর্ণ থাকিত। পারাবত বাসস্থানের ন্যায় প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে লোক। উপরের লোকেরা তাহাদের আবর্জ্জনাদি সুবিধা পাইলে নিম্নে প্রায়ই নিক্ষেপ করিত। সুতরাং নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠ-বাসিদিগের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এ সকল যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা ছিল যে বাটীর পায়খানা নিম্নতলে থাকিত। হয়ত তাহারই পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে পাকশালা। তাহারই সম্মুখে বাসের ঘর। সেই ঘরের ভিতরের চুণকাম কোথায় লোণা লাগিয়া খসিয়া পড়িয়াছে—কোথাও বা তাহার অংশবিশেষ তাম্বুলরাগরক্ত নিষ্ঠীবনে রঞ্জিত হইয়াছে। ঘরের আসবাবের মধ্যে সুন্দরবনজাত সুলভ কাষ্ঠের দুই একখানি তক্তপোষ। তাহার উপর জীর্ণ ছিন্ন একখানি মাদুর বিস্তৃত। ধূলি সংযোগে তাহা হয়ত তক্তপোষের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে লিপ্ত হইয়া আছে। তক্ত-পোষের নিম্নে অন্ধকার প্রদেশে তৈলপায়িকাগণ পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে। নবাবী অত্যাচারের ভয়ে ভীত বণিয়াদি ঘরের মহিলাগণের ন্যায় তখনও অসূর্য্যম্পশ্যরূপ হইয়া আছে। এ সকল ছাড়া গুপ্ত কবির

"রেতে মশা দিনে মাছি"

ত ছিলই। সংক্ষেপতঃ এখনকার কলিকাতা ও তখনকার কলিকাতায় স্বর্গ নরক প্রভেদ ছিল। বিশেষতঃ গরিবের পক্ষে।

বঙ্গের পল্লীগ্রামের সুশ্যাম তৃণশস্যশোভিত ও বৃক্ষলতাগুল্ম পরিবেষ্টিত মাঠ ঘাট ত্যাগ করিয়া, মুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে কলিকাতার পূতিগন্ধময় প্রকোষ্ঠে বাস করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা বলাই বাহুল্য। বালক ঈশ্বরচন্দ্র স্নেহময়ী জননী ভগবতী দেবী, প্রিয় জন্মভূমি বীরসিংহ ও শৈশব সহচরগণকে ছাড়িয়া পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া ঐরূপ কোন প্রকোষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান,

তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার পিতার দারিদ্র্যের সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এক সময়ে আহারাভাবে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একখানি পিত্তলের ভোজনপাত্র বন্ধক বা বিক্রয়ের জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইহার পর অবশ্য তাঁহার অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছিল অর্থাৎ মাসিক দুই টাকা হইতে দশ টাকা আয় হয়। এই সময়ে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থে কলিকাতায় আনেন। পুত্রের সুশিক্ষার জন্য পিতার আগ্রহ ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়। কথিত আছে মাতৃদোষে পুত্র রুগ্নতা এবং পিতৃদোষে মূর্খতা প্রাপ্ত হয়। ইহা যদি সত্য হয় তবে দরিদ্র ঠাকুরদাসের গুণের উপর ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যালাভ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিল। আর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রে ঠাকুরদাসের পুণ্যলক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছিল। শাস্ত্রকার বলেন "পুত্রে যশসি তোয়ে নরাণাং পুণ্যলক্ষণং"।

ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় স্বীয় পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তখন সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদিগের বেতন লাগিত না। হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠের প্রথা ছিল। কোনরূপে আহারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিলে কলিকাতায় থাকিয়া পুত্রের সুশিক্ষা হইবে এই ভরসায় তিনি পুত্রকে কলিকাতায় আনিতে সাহসী হয়েন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদের এই সামান্য আহারের সংস্থানও সকল সময় ভালরূপে হইত না। বিদ্যাসাগরের চরিতাখ্যায়কগণ বলেন এই সময়ে তাঁহাদের এমন দিনও গিয়াছে যে ঝালের মৎস্য ঝোলে পরে তাহা অম্লে পাক করিয়া তিন সন্ধ্যা ব্যঞ্জন সুস্বাদ করিতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আসার কিছুকাল পরে স্বহস্তে দুবেলা পাক করিতে হয়। তাঁহার কলিকাতা আগমনের পর, ক্রমে ক্রমে অপর ভাইগুলি কলিকাতায় শিক্ষার্থ আনীত হয়েন। ইহাঁদের সকলের আহারাদি তাঁহাকেই প্রস্তুত করিতে হইত।

ভাইগুলি আসায় অন্যান্য গৃহকার্য্য যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। প্রাতঃ ও সায়াহ্ন কাল রন্ধনাদি নানাপ্রকার গৃহকার্য্যে অতিবাহিত হইত। দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিদ্যালয়ে থাকিতে হইত। সুতরাং দৈনিক পাঠাভ্যাসের জন্য তাঁহাকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। একে এই উৎকট পরিশ্রম তাহার উপর অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস সুতরাং অনেক সময় তাঁহার পীড়া হইত। কিন্তু ঐ সকল কিছুই তাঁহার সাধনায় বাধা দিতে পারে নাই। ঈশ্বরচন্দ্র পাঠে কখনও শিথিলপ্রযত্ন হয়েন নাই।

ইংরাজীতে বলে "TIME IS MONEY" অর্থাৎ সময়ই অর্থ। বাস্তবিক দরিদ্র বিদ্যার্থী অর্থাভাবে যেমন কষ্ট পায় সময়াভাবে সে ততোধিক কষ্ট পায়। অর্জ্জন ও অধ্যয়ন উভয়ই সময় সাপেক্ষ। অর্থাভাব হেতু তাহার যে ক্ষতি হয়, সময়ের অল্পতা হেতু তাহার আরও অধিক ক্ষতি হয়। পাঠের পক্ষে ইহা একটী মহৎ অন্তরায়। শরীর ও মনের বিশেষ বল না থাকিলে এই প্রকার বাধাকে অতিক্রম করা দুরূহ। ঈশ্বরচন্দ্র অর্থাভাব হেতু সময়াভাব বোধ করিতেন। পাচক ও দাসীর বেতন দিবার সামর্থ্য থাকিলে তিনি প্রাতঃসন্ধ্যায় পাঠের জন্য যথেষ্ট সময় পাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের তখন সে ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং স্বহস্তে দুসন্ধ্যা পাক, পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পরিচর্য্যা প্রভৃতি কর্ম্ম সমাপন করিয়া অধ্যয়নের যে প্রকৃষ্ট সময়, প্রাতঃকাল ও প্রথম রাত্রি, তাহা তিনি পাইতেন না, অথচ তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল। দৈহিক ক্ষুৎপিপাসার অপেক্ষা তাঁহার মানসিক ক্ষুৎপিপাসা প্রবলতর ছিল। অদম্য জ্ঞানের তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য তাঁহাকে বিশ্রাম ও নিদ্রার সময় অল্প করিতে হইত। যে সময়ে অন্য বালক পরিশ্রমান্তে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিত—সে সময় ঈশ্বরচন্দ্র পাঠে তন্ময়চিত্ত। যে সময়ে

প্রকৃতি সুষুপ্তির ক্রোড়ে অচেতন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক তখন ক্ষুদ্র মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণালোকে অধ্যয়নতৎপর। সমস্ত দিবসের উৎকট পরিশ্রমের পর দেহ অবসন্ন হইয়াছে—শ্রান্তদেহ বিশ্রাম চাহিতেছে, নিদ্রা আসিয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত মস্তকটী নিজ ক্রোড়ে লইতে চাহিতেছেন কিন্তু ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র দেহের সে অবসন্নতা উপেক্ষা করিয়া জননী নিদ্রাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। যখন ছাত্ররূপী ঈশ্বরচন্দ্রের এইরূপ অধ্যয়ন তপ সাধনা দেখি, তখন হৃদয় মন বাস্তবিক এক অপূর্ব্ব প্রশংসার ভাবে পূর্ণ হয়। "ছাত্রদিগের অধ্যয়নই যে তপ" এ কথা তিনি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। পাঠদ্দশায় তিনি এক জন উৎকৃষ্ট ছাত্রের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বহুবিধ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়েন এবং তাহার জন্য তিনি অনেক বৃত্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। পরিশেষে ঊনবিংশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্ররূপে বিদ্যামন্দিরে সাধনা শেষ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র এখন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও সাক্ষাৎভাবে ছাত্ররূপে অধ্যয়ন শেষ করিলেন সত্য, কিন্তু তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে পরবর্ত্তী জীবনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত থাকেন। সংস্কৃত কলেজের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক পাঠে তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণার হয় তৃপ্তি নাই। উত্তর জীবনে তিনি বহুবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রও আর কয়টী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তাঁহার বৃহৎ পুস্তকাগার দেখিলেই বুঝা যায় যে তিনি কিরূপ অধ্যয়নপর ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনের কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পঞ্চাশ টাকা বেতনে শিক্ষকের পদ পান। তখনকার সিভিলিয়ানদিগের দেশীয় ভাষা ও আইনাদির শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য ঐ কলেজ স্থাপিত হয়। সাহেবদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে

হইলে ইংরাজী ও হিন্দি জানা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা করিতেন তাহা উত্তমরূপেই করিতেন। ইহাই তাঁহার প্রকৃতি ছিল। সুতরাং সাহেবদিগের সুশিক্ষার জন্য নিজে কলেজ ত্যাগের পর শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ইংরাজী ও হিন্দিভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সাহেবদিগের বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকের অভাব থাকায় তাহা দূর করিবার মানসে বাসুদেব চরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবনচরিত রচনা করেন। বাসুদেবচরিত মুদ্রিত হয় নাই। অপর দুইখানি মুদ্রিত হয়। এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে ঐ দুখানি পুস্তকই তাহার প্রথম প্রয়াস। এখানে কিছুদিন কর্ম্ম করার পর তিনি সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। কিছুকাল এই কর্ম্ম করার পর তদানীন্তন সম্পাদকের সহিত কোন সংস্কারকার্য্যে তাঁহার মতান্তর হয় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় তিনি আত্মসম্মানের অনুরোধে কর্ম্মত্যাগ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে নিযুক্ত হওয়ার পর হইতেই তিনি তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে দাসত্ব বিমুক্ত করিয়া স্বগ্রামে পাঠাইয়া দেন এবং আপনার আয় হইতে মাসিক যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতেন। বাকী টাকায় কলিকাতার বাসায় অনেক গুলি আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করিতেন। অর্থকষ্ট কি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা জানিতেন। কিন্তু দরিদ্র হইলেও তিনি আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ছিলেন না। সেই জন্য আত্মসম্মানের অনুরোধে পুনরায় অর্থকষ্ট হইবে জানিয়াও সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মত্যাগ করিলেন। যাহা হউক ইহার অল্পদিন পরে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড্‌রাইটারের পদ প্রাপ্ত হন এবং তৎপরে পুনরায় সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে তথাকার সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যতৎপরতায় প্রীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে

ক্রমে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কয়েকটা জেলায় অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যও করিতে হইত। এই সময় তাঁহার মাসিক আয় ৫০০ পাঁচ শত টাকা। এই সময় তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত মতভেদ হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অম্লানবদনে ত্যাগ করেন। ফোর্টউইলিয়ম কলেজের শিক্ষকতা হইতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কার্য্য পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁহার চাকরীর কাল বলিয়া পরিগণিত। অধ্যক্ষতা ত্যাগের সময় তিনি ডিরেক্টর সাহেবকে ইংরাজীতে যে পত্র লেখেন তাহার অংশাবশেষ এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার যে তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান সঙ্কল্প ছিল তাহা উহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঐ পত্রে তিনি তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান সঙ্কল্পের কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বদেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য তাঁহার চিরকালই গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগ করাতে যদিও সাক্ষাৎভাবে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল সত্য, তথাপি বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিবেন ইহা তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা ছিল। তিনি স্বদেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার রূপ যে সুমহান্ ও পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সাধনা জীবনের সহিত শেষ করিবেন ইহাও ঐ পত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়াছিলেন।

এতদিনে আমরা তাঁহার জীবনের সঙ্কল্পের কথা তাঁহারই মুখে শুনিলাম। এক্ষণে তাঁহার জীবনাবিবৃতকার্য্যকলাপে সেই সঙ্কল্পের সাধনা দেখা যাউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকৃত সাধক ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ভুলেন নাই। কথিত আছে, তিনি যখন ফোর্ট-

উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা করিতেছেন তখন একদিন লর্ড হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নানা কথা বার্ত্তা হইতেছে। এমন সময় কথাপ্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার কথা উঠে। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের প্রতি গভর্ণমেণ্ট তেমন অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না; তাঁহাদের জীবিকার জন্য কাজকর্ম্ম মিলা ভার। ইহার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং ছাত্রসংখ্যাও কমিতেছে। গভর্ণমেণ্ট ইহাঁদের জন্য কিছু করিলে ভাল হয়। ইহার পরই লর্ড হার্ডিঞ্জ একশত একটী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের জন্য সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণকে শিক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য আদেশও দেন। এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানে মূলে, সুন্দর সৌধের ভিত্তির ন্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় লুক্কায়িত। এই অনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রত্যক্ষ ও গৌণভাবে সংস্কৃত শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ইহার পর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন তখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার, বহুমূল্য রত্নরাজির ন্যায় হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল মুদ্রণ, সহজবোধ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ, সহজপাঠ্য পুস্তক সঙ্কলন প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য দ্বারা দেশে দেবভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই অতিরিক্ত পরিদর্শকের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশের শিক্ষা বিস্তারের বহুল সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপে বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি পূর্ব্বাপর জানিতেন যে, দেশে সুপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকের অত্যন্ত অভাব। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে শিক্ষাদান করিবার সময় তাঁহার

বিদেশীয় ছাত্রবর্গের জন্য দু একখানি গ্রন্থ রচনার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বদেশীয় বালক ও যুবকগণের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনিই লোকের মনে জ্ঞানের ক্ষুধার সঞ্চার করেন এবং তিনিই উপযুক্ত পুস্তক রচনা করিয়া সে ক্ষুধার তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রস্তুত করেন।

বিভীষিকাপূর্ণ সাধনক্ষেত্রে সাহসের আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে সে সাহস যথেষ্ট ছিল। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা করিবার জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিতে কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের সহিত মতান্তর হওয়ায় কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না এই জন্য কর্ম্মত্যাগ করেন এ কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর আবার ডিরেক্টর সাহেবের সহিত যখন মতান্তর হয় তখনও আত্মসম্মান ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে ৫০০ পাঁচ শত টাকা বেতনের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে তিনি একটী বৃহদ্ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন। ব্যাপারটী সুসম্পন্ন করা অন্যান্য বিষয়সাপেক্ষ হইলেও প্রচুর অর্থসাপেক্ষ ছিল। ব্যাপারটী আর কিছুই নহে—বিধবাবিবাহ প্রচলন। শাস্ত্রের সাপেক্ষতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজের অনুমোদনসাপেক্ষতা, হিন্দুসমাজের সাপেক্ষতার উপর উহা নির্ভর করিলেও উহার প্রচলনের জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত অর্থ সম্পত্তি ছিল না—নিজে ইদানীন্তন মোটা মাহিনা পাইলেও আত্মীয় স্বজন পালনে এবং দীন দুঃখীর সেবায় ও অন্যান্য সদ্ব্যয়ে ইহা সমস্ত খরচ হইয়া যাইত। সুতরাং নিজের উপার্জ্জিত ধনও এত সঞ্চিত ছিল না যে যাহা উপর নির্ভর করিয়া তিনি চাকরী ত্যাগ করিতে সাহসী হয়েন। তিনি যখন কর্ম্মত্যাগ করেন তখন তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন গণ্যমান্য

লোক। তিনি বহু আশ্রিত জনের প্রতিপালক; অনেক রাজা মহারাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু, অনেক বড় বড় সাহেব স্থবার শ্রদ্ধার পাত্র ও পরামর্শদাতা। দেশের গণ্য মান্য লোক তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন—তাঁহার মিত্রতায় আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। কলিকাতা সমাজে যাঁহার এরূপ প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি তিনি কোন ভরসায় এমন একটা বড় চাকরী ত্যাগ করিতে সাহসী হইলেন এ প্রশ্ন স্বতঃই লোকের মনে হয়। বাস্তবিক প্রকারান্তরে একজন বড়লোক তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সুহৃদ্ বাঙ্গালার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবই তাঁহাকে প্রকারান্তরে পরামর্শচ্ছলে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা দিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। তিনি বলিয়াছিলেন "যখন বুঝিয়াছি এক পোয়া চাউল হইলে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দিনপাত হইবে, তখন আর অর্থের অনুরোধে আত্মসম্মান নষ্ট করিব কেন?" এরূপ মনের বল না থাকিলে কি কখন কেহ তাঁহার মত অবস্থায় এমন কথা বলিতে পারে? তিনি নির্লোভ, অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি বিষয় বিভবের মধ্যে বাস করিয়া তাহার মোহে আচ্ছন্ন হয়েন নাই। তিনি নিজের সুখবিধানের জন্য অভাব বৃদ্ধি করেন নাই। সামান্য অশন বসনে তিনি চিরদিন পরিতুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অভাব বাস্তবিকই এক পোয়া চাউলে মোচন হইত আর সেই জন্যই অর্থের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইয়া ঐরূপ কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহার ন্যায় পদ প্রাপ্ত হইলে, মান সম্ভ্রমের অধিকারী হইলে গণ্যমান্য বন্ধুবর্গ পাইলে, শত অপমান ও নিগ্রহ সহ্য করিয়া চাকরী বাচাইয়া চলিতেন। তাঁহারা অবস্থার দাস। তাঁহাদের বিশ্বাস লোকে অবস্থার পূজা করে, অর্থের খাতির করে।

তাঁহাদের মতে মানুষে মনুষ্যত্বের আদর বড় কম করে। সুতরাং সুখসম্পদ, মানসম্ভ্রম লোকজন বন্ধুবান্ধবের মূলীভূত কারণ যে অর্থ তাহার জন্য বিবেকবুদ্ধি, কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং আত্মসম্মান সকলই বিসর্জ্জন দিতে পারা যায়। এইখানে সাধারণে অসাধারণের পার্থক্য। এইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয় অসাধারণ লোক ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহসী পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন বীরপুরুষকে বরণ করিয়া থাকেন। এই বসুন্ধরাই বীরভোগ্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মত্যাগ করাতে তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের অধিক চিন্তা হইয়াছিল, যাহা হউক সুখের বিষয় যে এজন্য তাঁহাদিগকে বেশী দিন চিন্তা করিতে হয় নাই। তাঁহার রচিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পুস্তক সকল হইতে তাঁহার যথেষ্ট আয় হইয়াছিল। শুনা যায় এক সময় তাঁহার পাঁচ শত টাকার স্থলে পাঁচ হাজার টাকা মাসিক আয় হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি সমধিক সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রভূত অর্থের অধিকাংশ দীনহীনজনের দুঃখকষ্টলাঘবের জন্য ব্যয়িত হইত, এবং এইজন্য দীনহীন জন তাঁহাকে দয়ার সাগর নাম দিয়াছিল।

বিবিধ পুস্তকাদি প্রচলন দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের পথ তিনি সুগম করিয়া গিয়াছেন সত্য। সরকারী কর্ম্মচারীরূপে বহুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সত্য। কিন্তু এ সকল ব্যতীত নিজের অর্থ দ্বারা দেশে উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার আর তুলনা নাই। তুলনা নাই এইজন্য বলিতেছি যে মিশনরী কলেজ ছাড়া বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা কার্য্যে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক। মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে কলেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দেশে উচ্চশিক্ষার স্রোত মন্দ ভাবে চলিতেছিল। সরকারী কলেজে ১২ টাকা বেতন দিয়া পড়ার

ক্ষমতা সকলের ছিল না। মিশনরী কলেজগুলিতে বেতনের হারও নিতান্ত কম ছিলনা। তাহা ছাড়া মিশনরী কলেজে শিক্ষার্থে যুবক-গণকে পাঠান অনেক অভিভাবকদিগের অনুমোদিত ছিলনা। ভয় পাছে, তাহারা খৃষ্টান হইয়া যায়। সাধারণে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সুবিধার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহই ঐরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হয়েন নাই। অধুনা দেশীয় শিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত যে সকল কলেজ দেখা যায় মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসন তাহাদের মধ্যে প্রথম। প্রথম পথপ্রদর্শককে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সমস্তই অকাতরে বীরের ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিতে তত সহজে সম্মত হয়েন নাই। উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। প্রথমে কর্ত্তৃপক্ষগণ মেট্রপলিটনে এফ, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত খুলিতে অনুমতি দেন। পরে পরীক্ষার ফল ভাল হওয়াতে উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। এই কলেজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। অথচ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ও প্রশংসার বিষয় এই যে, কলেজের এক কপর্দ্দক তিনি নিজের জন্য ব্যয় করেন নাই। এইরূপ নিস্বার্থভাব সচরাচর দেখা যায় না।

বঙ্গ দেশের সাহিত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চ। লোক শিক্ষার জন্য তিনি আজীবনব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিরূপ উপায়ে, কত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি সে পবিত্র ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহা অতি সংক্ষেপে

বিবৃত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুণ্যশ্লোক। তাঁহার পুণ্যকাহিনী তাঁহার নামের গুণেই সুশ্রাব্য। সেই ভরসায় ইহা এরূপভাবে এখানে কথিত হইল। আর আশা করা যায় যে, কর্ম্মক্ষেত্রে বঙ্গীয় যুবক তাঁহার সাধনপ্রসঙ্গ শুনিয়া কর্ত্তব্যব্রত ক্লেশ ভুলিয়া যাইবেন এবং নবীন উদ্যমে সে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চেষ্টা করিবেন।

অনেকের ধারণা, এমন কি বিশ্বাস, যে যাঁহারা চাকরী করেন, তাহাদের অবসর অত্যন্ত অল্প, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কোন মহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। চাকরীর অনেক অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া মানুষ চাকরী গ্রহণ করিলে জীবিকার্জ্জন ব্যতীত জ্ঞান ধর্ম্ম ও জনহিতের জন্য কোন কার্য্য করিতে পারে না এমন কথা বলা কতদূর সত্যসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত তাহা বলিতে পারি না। যাহার সঙ্কল্প দৃঢ় নহে, আরব্ধকর্ম্মে যাহার আস্থা ও অনুরাগ নাই, তাহার মুখে ঐরূপ কথা শোভা পায়। সে ঐরূপ কথা বলিয়া, ওজর করিয়া অন্যকে বুঝাইতে চাহে ও মনকে প্রবোধ দেয়। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই জীবিকার জন্য গভর্ণমেণ্টের অধীনে বা অন্যত্র চাকরী করেন। গভর্ণমেণ্ট প্রজার দুঃখ মোচন বা উন্নতি-সাধনের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বের অপেক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অধিক। ইঁহারা যদি চাকরীর অজুহাতে সকল হিতকর কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিতে চাহেন তবে দেশের গতি কি হইবে? তাঁহারা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করুন, কিন্তু অবসর সময়ে দেশের জন্য ও দশের জন্য ভাবুন তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন। ইচ্ছা থাকিলে আর প্রাণের সহিত চেষ্টা করিলে তাঁহারাও যে সকল দিক রক্ষা করিয়া যথেষ্ট হিতকর কার্য্য করিতে পারেন, তাহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা

স্বনামধন্য স্যর সৈয়দ আহম্মদের জীবনে দেখিতে পাই। স্যর সৈয়দ আহম্মদ ৩৭ বৎসর গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। সাধারণ সেরাস্তাদারের পদ হইতে নিজের কর্ম্ম-নৈপুণ্যের গুণে শেষে সদর আলার পদ প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তিনি শুধু চাকরী বাঁচাইয়া চলিয়াছিলেন এমন নহে, অধিকন্তু তাহাতে সমূহ উন্নতি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য যে তাঁহাকে অনেক সময় দিতে হইত ও বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইত তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তিনি কিরূপে স্বজাতির উন্নতিসাধন ও ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা জানা আবশ্যক।

১৮৩৮ খৃঃ অঃ আত্মীয়স্বজনের অমতে তিনি ইংরাজের অধীনে দিল্লীর ফৌজদারী আদালতে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার ৪ বৎসর পরে তিনি মুন্‌সেফের পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই সময় হইতে তিনি সাহিত্য সেবা আরম্ভ করেন। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ তিনি দিল্লীর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। দিল্লীর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রথমে ইহার তেমন আদর হয় নাই। পরে যখন ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তখন সাধারণের দৃষ্টি ইহার উপর পতিত হয়। এবং এই গ্রন্থ রচনার পুরস্কারস্বরূপ তিনি ইংলণ্ডের রয়াল এশিয়াটীক সোসাইটীর একজন মাননীয় সভ্যের পদ প্রাপ্ত হয়েন। সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে তিনি নানা স্থানে বদলী হয়েন। ক্রমে ১৮৫৫ খৃঃ অঃ তিনি বিজনৌরের সদর আমীনের কার্য্যে বদলী হইয়া আসেন। ইহার কিছু দিন পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃঃ অঃ মে মাসে সিপাহী বিদ্রোহ

ঘটে। সেই অগ্নি পরীক্ষার সময় সৈয়দ আহম্মদ বিজনৌরে। তাঁহারই রাজভক্তি ও বুদ্ধিমত্তার গুণে সেখানকার ইংরাজ পুরুষ মহিলা ও বালকবালিকাদিগের জীবন রক্ষা হয়। তিনি না থাকিলে বিদ্রোহী-দিগের হস্তে ইংরাজগণের যে কি দুর্গতি হইত তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সৈয়দ আহম্মদ এই সময় যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা সাহসিকতা, এবং রাজভক্তির পরিচয় দেন, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মে মাসের মাঝামাঝি বিজনৌরে বিদ্রোহের সংবাদ প্রচার হয়। এই দুঃসংবাদ পাইয়া তত্রস্থ ইংরাজগণ আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজনৌরে ইংরাজের সাধারণ জেলার পুলিস ভিন্ন অন্য সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না। কলেক্টর সাহেব সৈয়দের সাহায্যের জন্য একশত পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, মনে করিলেন দুর্দ্দিনে ইহারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। বিদ্রোহ সংবাদ বিজনৌরে পহুঁছিবার অল্পদিন পরেই বিজনৌর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের দুর্বৃত্তগণ জেল আক্রমণ করে। সরকারী খাজনাখানা আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিয়া সৈয়দ আহম্মদ কলেক্টারের অনুমতিক্রমে সমস্ত টাকা কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদল বিদ্রোহী সেনা সেখানে উপস্থিত হইল। সকলেই, কি হয় কি হয় ভাবিতে লাগিলেন। যাহা হউক এই দলের দুইজন অধিনায়ককে কলেক্টর সাহেব ও সৈয়দ আহম্মদ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলাতে তাহারা বিজনৌরে কোনও উপদ্রব না করিয়া দিল্লীর পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বিজনৌর অধিবাসিগণের তাহাতে ভয় গেল না। আবার কয়েক দিনের মধ্যে শুনা গেল যে নবাব মহম্মদ খাঁ বহুসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য লইয়া বিজনৌর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এই সময়

কলেক্টর সাহেবের সংগৃহীত পাঠান সেনাগণের বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ পায়।

ইংরাজদের যাহা কিছু সামান্য আশা ভরসা ছিল তাহাও গেল। ক্রমে ভীষণ ভবিষ্যত ভীষণতর বর্ত্তমানে পরিণত হইল। নবাব মহম্মদ খাঁ সসৈন্যে বিজনৌরে উপস্থিত। যে বাটীতে নগরের সমস্ত ইংরাজ পুরুষ মহিলা ও বালক বালিকাগণ একত্র বাস করিতেছিলেন তাহা নবাবের সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কখন কি হয় এই চিন্তায় সকলে আকুল। এমন সময় একটী গুপ্ত পথ দিয়া সৈয়দ আহম্মদ ইংরাজগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পলায়নই তখন একমাত্র উপায় ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু কি উপায়ে উহা সম্ভব—তাহাই সকলে ভাবিতে লাগিলেন। যখন অন্য সকলে ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, তখন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া দূতবেশে নিরস্ত্র হইয়া সৈয়দ আহম্মদ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিলেন। সৈয়দ, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করুন এ কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। কিন্তু নিরস্ত্র হইয়া শত্রুশিবিরে যাইতে তাঁহাকে কেহই পরামর্শ দিলেন না; অধিকন্তু নিষেধ করিলেন। সৈয়দ তাঁহাদের কথা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। নিরস্ত্র হইয়া তিনি নবাবের শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে প্রতি পদে প্রহরী তাঁহার গতি রোধ করিতে চাহে। দুই জন প্রহরীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শেষে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—তখন তিনি সেখান হইতে নবাব শুনিতে পান এরূপ ভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন; তিনি মসীজীবী, নিরস্ত্র হইয়া নবাবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। নবাব অনুমতি দিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৈয়দ মহোদয় নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া নিজের আগমনোদ্দেশ্য একান্তে নিবেদন

করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবাব আপনার সঙ্গীগণের মনস্তুষ্টি ও মানবৃদ্ধির জন্য বলিলেন যে তাঁহারা সকলে ত ভাই ভাই। তাঁহাদের মধ্যে গোপনীয় কিছু নাই। সৈয়দ মহোদয়ের যাহা কিছু কিছু বক্তব্য তিনি সর্ব্ব সমক্ষে বলিতে পারেন। ইহার পর তিনি বুঝাইয়া বলাতে নবাব উঠিয়া আসিয়া নির্জ্জনে সকল কথা শুনিলেন। সৈয়দ আহম্মদ নানামতে নবাবকে বুঝাইয়া শেষে দুটী প্রস্তাব করিলেন। একটী—নবাব, তিনি ও অন্যান্য কয়েকজনে মিলিত ইংরাজগণকে হত্যা করা অপরটী, ইংরাজদিগকে স্থানত্যাগ করিতে সাহায্য করা। দ্বিতীয়টীতে সম্মতি দিলে তাঁহারা নবাবকে লিখিয়া পড়িয়া সে বিভাগের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবেন; এবং খাজনাখানার সহিত অন্যান্য সমস্ত মালপত্র তাঁহার হস্তে দিবেন। এই সঙ্গে সৈয়দ সাহেব ইঙ্গিতে ইহাও বলেন যে ইংরাজদিগকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। কারণ দিল্লী শীঘ্রই ইংরাজের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কি জানি, যদি তাহারা জয়যুক্ত হয় তবে ইংরাজ হত্যার ফল বিষময় হইতে পারে। নবাব বুদ্ধিমানের মত দ্বিতীয় প্রস্তাবটী স্বীকার করিলেন এবং যান বাহন অর্থাদি দ্বারা ইংরাজদিগের পলায়নের সাহায্য করিলেন। কলেক্টর সাহেব সৈয়দ মহোদয়ের সহযোগে পারসীতে একখানি ফারমান লিখাইয়া নবাবকে দিলেন। নবাব মহম্মদ খাঁ তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সৈয়দ সাহেবকেই তৎ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন—কিন্তু সৈয়দ সাহেবের সর্ত্তে নবাব সম্মত না হওয়াতে তাহা ঘটে নাই। ইংরাজেরা ত বিজ-নৌর হইতে স্থানান্তরে গিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। সৈয়দ আহম্মদ ভগবান ও ভাগ্যের উপর ভরসা করিয়া সেই শত্রুপুরীতে রহিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই সকল কথা বিভাগীয় কমিশনর সাহেবকে জ্ঞাপন

করিয়াছিলেন। বিভাগীয় কমিশনর স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সৈয়দ আহম্মদকেই জেলার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। এই ঘটনার এক মাস গত হইতে না হইতে পুনরায় বিজনৌরে উপদ্রব আরম্ভ হইল। একদল হিন্দুসেনা একখানি মুসলমানের গ্রাম ধ্বংস করে। তাহাতে মুসলমানেরা বিদ্রোহী হয় এবং সৈয়দ আহম্মদকেই উহার মূলীভূত কারণ বিবেচনায় তাহার প্রাণ লইবার চেষ্টা করে। তিনি কোনরূপে নগর হইতে নগরান্তর—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে দেড় মাস পরে নিজ জন্মভূমি দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই দিল্লী লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দিল্লী তখন সদ্যঃ বিপন্মুক্ত। বিদ্রোহীদল বিপর্য্যস্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারের চিহ্ন সর্ব্বত্র তখনও দেখা যাইতেছে। সৌধ-সুশোভিত সেই সুন্দর নগর যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সৈয়দ আহম্মদ আসিয়া জন্মভূমির এই দশা দেখিলেন—কিন্তু জননীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ইংরাজের অনুরক্ত ও বিশ্বাসী বন্ধু এবং কর্ম্মচারী জানিয়া বিদ্রোহীগণ তাঁহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী অনেক কষ্টে কোনরূপে অশ্বপালকের গৃহে তৃণস্তুপের মধ্যে লুকাইয়া আছেন এইকথা তিনি শুনিতে পাইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর পুত্র মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন—মাতা পুত্রের মিলন হইল।

বিদ্রোহের বিপদ এইরূপে কাটিয়া গেল। দেশে ক্রমে শান্তি স্থাপিত হইতে লাগিল। সৈয়দ আহম্মদ ক্রমে বিজনৌর হইতে গাজিপুরে বদলী হইলেন। শুভক্ষণে তাঁহার গাজিপুরে বদলী হয়। ইতিপূর্ব্বে সৈয়দ মহোদয়ের সাহিত্যসেবার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশ ও স্বজাতীর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে লাগিল। গাজিপুরে আসিয়া তিনি একটী বিজ্ঞান সভা স্থাপনা করেন।

এই সময়ে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক কর্ণেল গ্রাহামের সহিত পরিচয় হয়। কর্ণেল সাহেব, সৈয়দ আহম্মদকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন—তাঁহাকে সোদরপ্রতিম জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম তাঁহার গাজিপুরে বদলী শুভক্ষণে হইয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার সুফলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও গভীর আস্থা ছিল। ইংরাজী ভাষা অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার। ইহাতে লিখিত গ্রন্থ সকল দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইলে আর তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ হইবে ইহা তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। অবশ্য এই অনুবাদ কার্য্য দ্বারা ইংরাজী শিক্ষার গতিরোধ করা যে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার গাজিপুরে অবস্থান কালে তাঁহার পরামর্শ ও নির্দ্দেশে অনেকগুলি ইংরাজী সদ্‌গ্রন্থ উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত হয়। সভার কর্ম্মস্থান পরে গাজিপুর হইতে আলিগড়ে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সভা দ্বারা উর্দ্দু ভাষার অঙ্গ বিশেষরূপে পুষ্ট হইয়াছে। ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত, বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্পবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। ইহার জন্য উর্দ্দু ভাষা সৈয়দ আহম্মদের নিকট বিশেষ ঋণী।

রাজভক্ত সৈয়দ আহম্মদ যে ইংরাজের পরম হিতৈষী ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। রাজকর্ম্মচারী হইয়া রাজা ও প্রজার কল্যাণের জন্য রাজনীতির আলোচনা করিতে তিনি কখন বিরত হয়েন নাই। তিনি সৎসাহসী ও সত্যবাদী ছিলেন। ইংরাজের চরিত্রের মহত্ত্বে তাঁহার অতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত ইংরাজ, ন্যায়ের ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত কথা এই যে সৈয়দ আহম্মদ একজন বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন। তিনি

বিশ্বাসের বলে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছেন। তিনি সাধারণ্যে যে সকল ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে এবং তাঁহার অন্যান্য সর্ব্ব কার্য্যে তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রমাণ পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হই। তিনি স্বদেশের উন্নতির জন্য সতত চিন্তা করিতেন। শাস্তা ও শাসিতের মধ্যে যাহাতে সখ্য স্থাপিত হয় ইহা তাঁহার ঐকান্তিক কামনা ছিল এবং এজন্য স্বতঃপরত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রজার প্রতিনিধি যাহাতে রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রণাসভায় স্থান পান—বিধি প্রণয়ন কালে যাহাতে তাঁহার যুক্তি শুনা হয়—এ দেশের সুখ দুঃখের কথা যাহাতে বিলাতে মহা-সভায় উত্থাপিত হয়—তাহার জন্য তথায় প্রতিনিধি সভার প্রতিষ্ঠা হয়—এ সকলের জন্য তিনি বহুকাল পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সৈয়দ আহম্মদ যে সকল বক্তৃতা করেন তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি তিনি কিরূপ আন্তরিকতার সহিত রাজা ও প্রজার রাজনৈতিক কল্যাণ কামনা করিতেন।

যে সকল কর্ম্ম করিলে এবং যেরূপ সুখসম্পদ ও মানসম্ভ্রম লাভ করিলে লোকে আপনাকে সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত মনে করেন সৈয়দ আহম্মদ সে সকলই করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যে বয়সে আমাদের দেশের লোক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন সেই বয়সে সৈয়দ আহম্মদ দ্বিগুণ উৎসাহে সঙ্কল্পিত কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ এপ্রিল মাসে সৈয়দ আহম্মদ দুইটী পুত্ররত্ন লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। কেম্ব্রিজে পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত এবং ঐ ইতিহাস প্রসিদ্ধ কলেজের কার্য্য প্রণালী দৃষ্টে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে মুসলমানগণের জন্য তদনুরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠা এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডে তিনি ভারতপ্রত্যাগত অনেক গণ্যমান্য সাহেব বন্ধু পাইয়া-

ছিলেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা হইয়াছিল। এখানে তাঁহার লিখিত মহম্মদের জীবনীর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং উহা তিনি তুরস্কের সুলতান ও মিশরের খেদীবকে উপহার পাঠান। এই উপলক্ষে তিনি সুলতানকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি লেখেন যে বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান বিস্তার ও সভ্যতার প্রসারের সহিত মুসলমান-ধর্ম্মনীতির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। এবং এই সত্যই ঐ গ্রন্থে প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই পত্র ও তাঁহার লিখিত অন্যান্য পত্রাবলীতে দেখা যায় যে তিনি কিরূপ উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁহাতে ছিল না। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মী-ভ্রাতৃগণকে ভ্রান্তসংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকৃত ইস্‌লামের সেবা করিতে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন।

১৮৭০ খৃঃ অঃ শেষে সৈয়দ সাহেব বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া কাশীতে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হয়েন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি "মুসলমান সমাজসংস্কারক" নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। মুসলমান সমাজের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য, মুসলমানগণ স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যাহাতে বর্ত্তমান যুগের শিল্প, বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্য আলোচনা দ্বারা সম্যক্‌রূপে উন্নতি লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি ক্রমাগত লিখিতে লাগিলেন। এই পত্র দ্বারা মুসলমানসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক নিন্দা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। মুসলমান সমাজ শত মুখে উচ্চকণ্ঠে সৈয়দ সাহেবের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন বিদেশে—মক্কায় মোল্লা ও মৌলবীগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী নাস্তিক প্রভৃতি শব্দাবলীতে অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরসমীপে তাঁহার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। এমন কি অনেকে ঈশ্বরের ক্রোধোদ্রেকের অপেক্ষা না করিয়া হত্যা করিবার ভয়

দেখাইয়া তাঁহাকে বেনামী পত্র লিখিয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ এ সকল উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি অবিচলিতচিত্তে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহারই সাধনা অক্লান্ত ভাবে করিতে লাগিলেন। স্বদেশের কল্যাণ, স্বজাতি স্বধর্ম্মী মুসলমানগণের কল্যাণ কামনা ও সাধনা করিতে তিনি ক্ষণিকের জন্য বিরত হয়েন নাই।

বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অবসর পাইলেই নানা স্থান হইতে তাঁহার প্রস্তাবিত আলিগড় এঙ্গলো ওরিয়েণ্টেল কলেজের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ১৮৭৬ সালে ৩৭ বৎসর খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত চাকরী করিয়া পেন্সন লইলেন। এখন হইতে তাঁহার অবসর সময় বৃদ্ধি হইল। অতঃপর তিনি সমগ্র সময় কায়মনে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দিতে লাগিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ অঃ সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার আলিগড়ে অবস্থানকালে এ, ও, কলেজের শিক্ষার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই সময় তিনি কতকগুলি শিক্ষিত মুসলমানকে লইয়া একটী সমিতি গঠন করেন। কি উপায়ে উত্তমরূপে মুসলমানদিগের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য ঐ সমিতির জন্ম। কি কারণে মুসলমানগণ গভর্ণমেণ্টের স্কুল ও কলেজে তাদৃশ আগ্রহের সহিত আপন আপন সন্তানগণকে শিক্ষার জন্য পাঠান না, কি হেতুই বা তাঁহারা আপন আপন সন্তানগণকে পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে দেন না, তাহা স্থির করিবার জন্য সমিতি সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হইলেন। এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য তিনটী পুরস্কার, সমিতি কর্ত্তৃক ঘোষিত হইল। এই সকল রচনা ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া এ, ও, কলেজের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়। প্রথম অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া প্রস্তাবিত কলেজের স্কুল বিভাগ খোলা হয়। তাহার পর

১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন আলিগড়ে আসিয়া সৈয়দ আহম্মদের কীর্ত্তিমন্দির বর্ত্তমান প্রশস্ত এ. ও. কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। মুসলমানগণের ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার থাকাতে তাঁহারা সৈয়দ আহম্মদের কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রথমতঃ সাহায্য করেন না। অধিকন্তু তাঁহারা বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষা সুন্দররূপে চলিতেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবকগণ দলে দলে উপাধি ভূষিত হইতেছিলেন, তখন ১৮৫৮—১৮৭৫ সাল ব্যাপী সময়ের মধ্যে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে সৈয়দ আহম্মদ জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। হিংস্রজন্তুপূর্ণ কণ্টকবৃক্ষ বেষ্টিত বনভূমি পরিষ্কার করিয়া তথায় সুধাধবলিত সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে স্থপতিকে যেরূপ ক্লেশ ও নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় সেইরূপ সত্যসন্ধ সৈয়দ আহম্মদকে, সম্প্রদায়ের হিংসাদ্বেষপূর্ণিত ভ্রান্ত সংস্কারপূর্ণ মনোভূমিতে জ্ঞানের সৌধ নির্ম্মাণ করিতে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যখন পশ্চিমোত্তর প্রদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সৈয়দ আহম্মদ জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের প্রথম চেষ্টার সূত্রপাত করেন তখন সে প্রদেশের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ইংরাজী শিক্ষার উপর ত লোকের ঘোর বিদ্বেষ ছিল। গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুল পাঠশালায় দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেও লোকের আপত্তি ছিল। বিদ্যালয় পরিদর্শক কোন সরকারী কর্ম্মচারী গ্রামে যাইলে লোকে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক আসিয়াছে বলিয়া দূরে পলায়ন করিত। যে সকল হিন্দু পরিবার হইতে এই সকল স্কুল পাঠশালার ছাত্র আসিত তাহাদিগকে অনেক সময় প্রতিবেশীগণের নিন্দা এমন কি অনেক সময় নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হইত। সাধারণ স্কুল পাঠশালায় পাঠাইয়া ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া মুসলমানদের এক প্রকার রীতি

বিরুদ্ধ ছিল। ধনী আমীর ওমরাও ঘরের ছেলেরা বাটীতে মৌলবীর কাছে শিক্ষা করিত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা প্রায়ই সন্তানের শিক্ষার আবশ্যক বোধ করিতেন না। আলস্যে নাচ তামসায় দিন কাটান নিন্দার কথা ছিল না। সাধারণতঃ মুসলমানেরা লেখনীর পরিবর্ত্তে তরবারি পছন্দ করিতেন। তখনও বাদশাহের জাতি বলিয়া বীরত্বের বৃথা অভিমান ছিল। কোন প্রবীণ মৌলবীকে পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা বলিলে তিনি ঝটিতি ঘৃণার সহিত নাসাকুঞ্চন করিয়া আবক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রুতে হাত দিয়া বলিতেন; সরকারী স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না, নেমাজ পড়িতে দেওয়া হয়না, মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি সম্মান করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় না, বালকদিগের খৃষ্টান হইবার সম্ভাবনা বেশী ইত্যাকার নানা কথা এক নিশ্বাসে বলিতেন। মোল্লা মৌলবীরা স্থিতিশীল। কিন্তু তাঁহাদের মতই সাধারণের মত। তাঁহাদের যুক্তি ও মত যে ভ্রান্ত, পাশ্চাত্যশিক্ষা যে ধর্ম্মানুমোদিত, একথা বুঝাইতে সৈয়দ আহম্মদকে যে কত নিগ্রহ সহ্য করিতেছিল তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই সকল কষ্ট নিগ্রহ ও নিন্দা সহ্য করিয়া স্বজাতীর কল্যাণ কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি তাহারই সাধনা এত দিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছিলেন। ভারতে রাজ-প্রতিনিধি কর্ত্তৃক এ. ও. কলেজের ভিত্তি স্থাপন করাইয়া স্বজাতির কল্যাণকামনাটীকে যেন প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় দুর্গে রাখিয়া চিন্তার ভার কিছু লাঘব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজ এতদিনে রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইল। রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি ইহার উপর পতিত হইল।

অতঃপর কলেজ গৃহের জন্য সৈয়দ সাহেব অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হয়েন। এজন্য তিনি ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন— এক রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে গিয়াছেন। অনেক হিন্দু রাজা, মুসলমান

নবাব এতদর্থে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ভাবুকের ভাষায় অলঙ্কার দিয়া বলিলে তিনি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া মুখের অন্ন ত্যাগ করিয়া কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। সরল ভাষায় তিনি সত্য সত্যই স্বদেশী বিদেশী অনেকের কাছেই অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হইলে সেখানকার লোকে তাঁহার সম্মানার্থে একটী বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন। সৈয়দ আহম্মদ এই কথা অবগত হইয়া বলেন যে ভোজে তিনি তত তৃপ্ত বা সম্মানিত হইবেন না। ভোজের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই নগদ কলেজের জন্য দিলে তিনি বেশী সুখী ও সম্মানিত হইবেন। ভাবুকের ভাষায় ইহাই মুখের অন্ন ত্যাগ করা। এইরূপে ও অন্যান্য লোকের দত্ত অর্থে তিনি সে যাত্রায় এক হায়দ্রাবাদ হইতে ত্রিশ হাজার টাকা আনেন। বৃদ্ধ বয়সে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া তিনি কলেজগৃহ নির্ম্মাণের জন্য হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান পার্সী প্রভৃতি সর্ব্ব ধর্ম্মের লোকের নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই জীবদ্দশায় কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছিল। মুখ্যতঃ মুসলমানগণের শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও সর্ব্বশ্রেণী ও ধর্ম্মের লোকের শিক্ষার জন্য ইহার দ্বার সতত উন্মুক্ত। মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য এ. ও. কলেজ আদর্শস্থানীয়। নূতন ও পুরাতনের এমন অপূর্ব্ব সম্মিলন কদাচিৎ দেখা যায়। মোল্লা ও মৌলবীগণের বাঞ্ছিত আরবীয় ধর্ম্ম দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষার সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্য, গণিত বিজ্ঞানের সুন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে আছে। মুসলমান ছাত্রবর্গের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য নেমাজের ব্যবস্থা আছে। যে বোর্ডিংএর প্রথা অধুনা বাঙ্গলায় প্রচলিত হওয়াতে আমরা সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি স্যর সৈয়দ বহুকাল পূর্ব্বের তাঁহার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া এ. ও. কলেজের সহিত তাহা স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

স্তর সৈয়দের কার্য্যে তাঁহার দূরদৃষ্টি দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। বহুদিনের পর কাশীতে এই আদর্শের একটী কলেজ হিন্দুগণের কল্যাণ কামনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহামতি রিপণের শাসনকালে ভারতের শিক্ষা নীতির উন্নতিকল্পে একটী শিক্ষাসমিতি (এডুকেশন কমিশন) গঠিত হয়। স্বনাম প্রসিদ্ধ ভারতহিতৈষী ডাক্তার হাণ্টার ইহার সভাপতি হয়েন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনেক গণ্যমান্য শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ভদ্রলোক ইহার সভ্য নিযুক্ত হয়েন। বঙ্গগৌরব মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু ও স্তর সৈয়দ আহম্মদের কৃতীপুত্র মাননীয় জজ মামুদও ইহার সভ্য ছিলেন। ভারতের প্রজাগণের বিশেষতঃ মুসলমানগণের শিক্ষার বিষয় স্তর সৈয়দ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফল সমিতির সমক্ষে বলিবার জন্য তিনি কমিশন কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েন। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শিক্ষা সম্পর্কীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হয়েন। বৃদ্ধ সৈয়দ সাহেব রজতনিভশ্বেতশ্মশ্রুশোভিত গম্ভীরমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় জীবনব্যাপী শিক্ষাসংস্কারবিষয়ক সাধনার কথা সমিতির সমক্ষে বলিতেছেন। সেই শিক্ষাসমিতির মধ্যে তাঁহার পুত্ররত্ন মাননীয় জজ মামুদ সদস্যরূপে সমিতির শোভা, সৈয়দ সাহেবের আনন্দ ও গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। পিতাপুত্রের এমন অপূর্ব্বসম্মিলন বাস্তবিক বড়ই মনোহর। এখনও কল্পনার সাহায্যে সেই দৃশ্য মনে করিলে আনন্দ হয়। আর প্রাচীন কবির সহিত বলিতে ইচ্ছা করে "সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম।" এই পবিত্র সঙ্গমে আমরা স্তর সৈয়দ আহম্মদের সাধনপ্রসঙ্গ শেষ করিলাম। আশা করি, কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় যুবক স্তর সৈয়দ আহম্মদের গৌরব ও ভাগ্য অভিলাষী হইয়া সাধনাক্ষেত্রে তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন।

সমাজবিপ্লবের সময় স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, আস্থা ও নিষ্ঠার সহিতনিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান করিয়া, প্রাচীনকালের ঋষির ন্যায় সরল নিরহঙ্কার এবং নিরলস হইয়া কেবল মাত্র দেবভাষা সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াও যে বর্ত্তমান যুগে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা সম্যকরূপে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য আমরা পণ্ডিতকুলতিলক তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনের সাধনার কথা আলোচনা করিতেছি।

তারানাথ আশৈশব অধ্যয়নপর ছিলেন। বালক তারানাথ অষ্টম বর্ষ বয়সে পাঠশালায় যাহা কিছু শিখিবার তাহা শিখিয়া লইলেন। গ্রাম্যগুরু তারানাথকে যখন আর নূতন কিছু শিখাইতে পারিলেন না, তখন তারানাথ পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং ৯।১০ বৎসর পিতা ও জ্ঞাতিভ্রাতার নিকট মনোযোগ পূর্ব্বক ব্যাকরণ, কোষ ও কাব্য অধ্যয়ন করিয়া সেই সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উত্তরকালে তারানাথ একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই ব্যাকরণের পাঠ তিনি স্বগৃহেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামে যে পরিমাণে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে উপাধি লইয়া সময়ে একটী চতুষ্পাঠী খুলিয়া নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু সেরূপ জীবন তারানাথ বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু নিজ গ্রামে বা তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোন গ্রামে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা মিটায় এমন কোন গুরু ছিলেন না। সুতরাং সম্যকরূপে বিদ্যাশিক্ষার জন্য সোৎসুকচিত্তে তিনি স্থানান্তরের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শেষে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বিদ্যামন্দির বাগ্‌দেবীর আরাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কলিকাতার তাৎকালিক অবস্থা অতি শোচনীয়

ছিল। একেত কলিকাতায় থাকিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভবনা ছিল, তাহা ছাড়া লোকের ধারণা ছিল যে যুবকেরা ঐ স্থানে থাকিলে উচ্ছৃঙ্খল ও বিধর্ম্মী হইয়া যায়। তারানাথের পিতারও এই ধারণা ছিল। এবং সেই জন্যই তারানাথকে কলিকাতায় পাঠাইতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এই সময়ে স্বনাম প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় কালনায় তারানাথদের বাটীতে উপস্থিত হয়েন। রামকমল সেন তখন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি তারানাথের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিদ্যা শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতাকে পরামর্শ দেন; এবং ইহাও বুঝাইয়া দেন যে তাঁহার অভিভাবকতায় থাকিলে তারানাথের উচ্ছৃঙ্খল বা বিধর্ম্মী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু এইরূপ বুদ্ধিমান যুবক সংস্কৃত পড়িলে উত্তরকালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইবেন। এই প্রস্তাবে তারানাথের পিতা সম্মত হইলেন। তারানাথ অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রমে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তারানাথ ১৮৩০ খৃঃ অঃ মে মাসে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েন। ক্রমে ক্রমে তারানাথ অলঙ্কার, সাহিত্য, বেদান্ত, জ্যোতিষ, ও ন্যায় শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। একেত তারানাথ প্রতিভাসম্পন্ন ও শ্রমশীল ছিলেন, তাহার পর তিনি যে সকল অধ্যাপকগণের নিকট ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহারাও তৎকালে তত্তৎ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তারানাথের পক্ষে সকল দিকে সুবিধা হইল। তারানাথ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট কাব্য, যোগধ্যান মিশ্রের নিকট জ্যোতিষ, নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত এবং নিমচাঁদ শিরোমণির নিকট ন্যায় অধ্যয়ন করিতে-লাগিলেন। সুশিক্ষা ও সদ্‌গুরু পাওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। এ বিষয়ে তারানাথ নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান ছিলেন। কি ধর্ম্ম, কি জ্ঞান,

সর্ব্ব বিষয়েই সদ্‌গুরুর প্রভাব অতিশয় প্রবল। গুণগ্রাহী সদ্ব্যক্তি মাত্রেই গুরুর গুণে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। পুত্র সুশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতে পারিলে পিতাও গৌরবান্বিত বিবেচনা করেন। মেসিদনের অধিপতি, মহাবীর সেকন্দরের পিতা ফিলিপ তদীয় পুত্রের শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আরিষ্টটলকে পাইয়া নিজকে ধন্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেকন্দরের জন্ম সম্বাদ পাইয়া আরিষ্টটল মহারাজ ফিলিপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ইহাতে, মহারাজ ফিলিপ বলেন যে, হে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ, পুত্র হওয়াতে আমি আনন্দিত হইয়াছি সত্য, কিন্তু এই পুত্র যে আপনার জীবদ্দশায় জন্মিয়াছে ও কালে আপনার নিকট শিক্ষা পাইবে, এই বিষয় চিন্তা করিয়াই আমি সমধিক আনন্দিত। জয়গোপাল, নাথুরাম ও নিমচাঁদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের জীবদ্দশায় তারানাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের অন্তিকে নানাশাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারিয়া ছিলেন। সুতরাং তারানাথের পিতার আনন্দ ও গৌরবের কথা মহারাজ আনন্দের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

তারানাথ অধ্যাপকগণের প্রতি একান্ত ভক্তিমান ছিলেন। অধ্যাপকগণও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তারানাথের পঠদ্দশায় প্রায় সকল পুস্তকই হস্তলিখিত ছিল। তিনি দিবাভাগে অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রিতে অনেক সময় অন্যের পুঁথি দৃষ্টে স্বহস্তে পুস্তক লিখিয়া লইতেন। বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রগণের ইহাতে অনেক উপদেশ লইবার বিষয় আছে। এক্ষণে দেখা যায় অভিধান দৃষ্টে পাঠ্যপুস্তকের শব্দার্থ লিখনকে ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে শ্রমসাধ্য এবং অনেকে উহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে কিছুকাল পূর্ব্বে বিদ্যার্থিগণকে পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্ত অন্যের পুঁথি

দেখিয়া নকল করিয়া লইতে হইত। টীকা ইত্যাদির কথা ত স্বতন্ত্র। একে ত তারানাথের স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল তজ্জন্য তিনি সতত অধ্যয়নপর থাকিতেন। তাহার উপর মুদ্রিত পুস্তকাদির অভাব হেতু পুঁথি নকল করার জন্য তাঁহার লিখনের অভ্যাস খুব ছিল। তিনি যেমন দ্রুত লিখিতে পারিতেন তেমনই সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইত। সর্ব্বদা লিখন পঠনে ব্যস্ত থাকায় তিনি ছাত্রজীবন হইতে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে পটু ছিলেন। উত্তরজীবনে বিবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রচারের ও তৎপ্রণীত বাচস্পত্যাভিধান নামক মহাকোষ সঙ্কলনের সামর্থ্যের সূত্রপাত তাঁহার পঠদ্দশাতেই দেখা যায়। তারানাথের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। অধীত শাস্ত্র তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই মহাভারত কণ্ঠস্থ করা সম্বন্ধে কথিত আছে যে, উহা তিনি চেষ্টা করিয়া পাঠ্য-পুস্তকের ন্যায় অভ্যাস করেন নাই। কেবল প্রুফ সংশোধন কালীন পাঠ করিয়াছিলেন মাত্র। ছাত্রাবস্থায় যে সূত্রে উহার প্রুফ সংশোধনের সুযোগ হয় তাহা এই :—তারানাথ যখন নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায় পড়েন তখন এসিয়াটীক সোসাইটীর উদ্যোগে সমগ্র মহাভারত মুদ্রিত হয়। নানা দেশীয় হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে বিভিন্ন পাঠের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মহাভারতের প্রুফ সংশোধনের ভার শিরোমণি মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। যখন এই গুরুভার শিরোমণি মহাশয় নিজশিরে গ্রহণ করেন তখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা। সে অবস্থায় ঐরূপ শ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। তারানাথ গুরুভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গুরুদেবের শ্রমলাঘব মানসে স্বয়ং ঐ কার্য্য নিজহস্তে গ্রহণ

করেন; এবং অতি দক্ষতার সহিত উহা সম্পন্ন করেন। শেষে যথন ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের নামে প্রচারিত হয় তথন তাহাতে গুরুর যশ মলিন হয় নাই, অধিকন্তু উহা সমধিক উজ্জ্বলই হইয়াছিল।

ক্রমে তারানাথ সংস্কৃত কলেজে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮০৩ খৃঃ অঃ তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশার শেষ হইল সত্য। কিন্তু তাঁহার ছাত্রজীবন ঐথানে শেষ হইল না। তিনি কাশীযাত্রা করিলেন। বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত বরুণা অসি ও জাহ্ণবী পরিবেষ্ঠিত সেই পুণ্যভূমি বারাণসী জগতে চিরকালই সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। সেই পুণ্যভূমিতে অনেক তত্ত্বদর্শী সংসারবিরাগী সিদ্ধপুরুষগণ বাস করেন। ইঁহারা শাস্ত্রের অনেক গূঢ় তত্ত্ব অবগত থাকেন। ইঁহাদের নিকট হইতে সত্য জ্ঞানলাভ করিবেন এই ইচ্ছায় তারানাথ কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি একজন পরমহংসের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েন। পরমহংস দেবের নিকট ন্যায়ের প্রসিদ্ধ পুস্তক খণ্ডনখণ্ডখাদ্য অধ্যয়ন করেন। ইহার পর অন্যান্য গুরুর নিকট মহাভাষ্য সহিত পাণিনীর ব্যাকরণ, সভাষ্য বেদ ও বেদান্ত জৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শন কপিল প্রণীত সাঙ্খ্য এবং যোগশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া তারানাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাশীতে তারানাথের ছাত্রজীবনের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল। অতঃপর চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যাপনার সময় উপস্থিত হইল। বাচস্পতি মহাশয় অধ্যাপকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সেই বংশের বোধ হয় তিনিই উজ্জ্বলতম রত্ন। অধ্যাপক হইয়া বিদ্যাদান করা তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। অন্যথা ইতিপূর্ব্বে তিনি আইন পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও সদর আমিনের কর্ম্ম

গ্রহণ করেন নাই কেন? সংস্কৃত শিক্ষা ও শাস্ত্র প্রচারের জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি জন্ম সার্থক করিয়া গিয়াছেন এবং প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কালনায় আসিয়া বাচস্পতি মহাশয় চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপকতা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা দেশের পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার যশঃসৌরভে মুগ্ধ হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। চিরন্তন প্রথা অনুসারে তিনি ছাত্রগণকে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকেই কৃতী ছিলেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা এক প্রকার স্বচ্ছল ছিল। দেবোত্তরের আয় ছাড়া অধ্যাপক পরিবার বলিয়া সামাজিক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিদায় আদায়েও তাঁহাদের আয় ছিল। এই সকলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকগণ এই সকল উপায় দ্বারা চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এখন অনেক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণকে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন, বৃত্তি এবং পুরস্কার দ্বারা অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেছেন। এজন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে সময় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ না ছাত্রের নিকট বেতন গ্রহণ করিতেন, না রাজার নিকট মাহিনা পাইতেন। অধিকন্তু ছাত্রগণের অধিকাংশের আহারাদির ব্যয়ভার তাঁহাদিগকেই বহন করিতে হইত। হিন্দুসমাজ যত দিন ক্রিয়াশীল ছিলেন ততদিন এই ব্রাহ্মণ্যসমাজ উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন। হিন্দুরাজগণ ও বহুবিত্তশালী ব্যক্তিগণ দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর দিয়া মন্দির, মঠ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠাও রক্ষা করিতেন। মধ্যবিত্ত-

গৃহস্থগণ ও নিত্যনৈমিত্তিক দেবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্যে দান করিতেন। এই সকল কারণে সংযমী স্বল্পে সন্তুষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ প্রতিপালিত হইতেন। আর তাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলকামনা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারাই উহার ব্যবস্থাপক ছিলেন। মনু যাজ্ঞবল্ক পরাশর প্রভৃতির মতে সংস্কার ও প্রায়শ্চিত্তাদির বিধি, মিতাক্ষরা দায়ভাগ অনুসারে দায়াদগণের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টনের ব্যবস্থা তাঁহারাই দিতেন। কিন্তু এ সকলের জন্য কখন বিত্ত গ্রহণ করিতেন না। এখন কালবশে সকলেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। নানা কারণে সমাজে বিপ্লব ঘটিয়াছে। অধ্যাপকসমাজ হিন্দুসমাজের নিকট আর সে সাহায্য পান না। যাহাও পান তাহা অতি সামান্য। তীক্ষ্ণধী বাচস্পতি মহাশয় সমাজের এই ক্রমিক পরিবর্ত্তন পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। চতুষ্পাঠী স্থাপনার পর স্বয়ং কার্য্যে ব্রতী হইয়া হিন্দুসমাজের উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য নিরুদ্বেগে করা যে সহজসাধ্য ব্যাপার নহে তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিলেন। তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিত। ভগবান তাঁহাকে অনবদ্য স্বাস্থ্য দিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই শ্রমশীল ছিলেন। সুতরাং তিনি যে স্বাবলম্বনের মূল্য ও মর্য্যাদা ভালরূপে বুঝিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য তিনি স্বোপার্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় অতঃপর স্বোপার্জ্জিত ধনে ছাত্রগণকে পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই প্রবর্ত্তনা, তাঁহার অধ্যাপক হইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, দশজন লোক প্রতিপালনের ইচ্ছা ও উহার গৌণউদ্দেশ্য ছিল। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ হইয়াও তিনি বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা সকল সময় উদ্দেশ্য ও উপায়ের পার্থক্য বুঝিতে পারি না।

আপনাদের আরব্ধ কার্য্যে একের পরিবর্ত্তে অপরটীকে লই এবং অপরের কার্য্যের বিচারকালেও ঐরূপ ভ্রম প্রায়ই করিয়া থাকি। বাচস্পতি মহাশয়ের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক অনেকে ভ্রান্তবিচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যের পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিয়াছেন বা যথার্থ ইতিহাস শুনিয়াছেন তিনি তাঁহার বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবসার অবলম্বনের উদ্দেশ্য বিচার করিতে ভুল করিবেন না ইহা বলা যাইতে পারে। বিদ্যাদান যে তাঁহার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প তাহা তিনি কোন দিন ও ভুলেন নাই। বাচস্পতি মহাশয়ের দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য আরও উত্তমরূপে বুঝা যায়। সাধারণতঃ লোকে ভোগবিলাসের জন্য ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বন্ধে একথা ক্ষণিকের জন্য কেহ বলিতে পারেন না। তিনি সংযমী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার অশন বসনে বিলাসের লেশ মাত্র ছিল না। তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন। তাহাও নিরামিষ। পোলাও কালিয়া, কারি কোপ্তার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইত না। পুণ্য-তোয়া জাহ্নবীর জলই তাঁহার স্পৃহণীয় পানীয় ছিল। সে বিশাল দেহ বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরীয় ও অমল ধবল যজ্ঞোপবীত গুচ্ছে শোভিত থাকিত। বিবিধ বিদ্যার আবাসভূমি সেই মুণ্ডিত শিরের শিখাগুচ্ছ ভিন্ন অন্য কোন মণ্ডন ছিল না। স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, উপাস্যদেবতায় অচলা ভক্তি, ক্রিয়াকাণ্ডে বিমল শুচি ও পরম নিষ্ঠার চিহ্ন তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাই। মহদুদ্দেশ্যে বৈশ্যবৃত্তি কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে আদর্শ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কি বলিব? পূর্ব্বতন ঋষি ও ঋষিকল্প ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান সংযম ও নিষ্ঠার জন্য তাঁহারা ভারতের হিন্দু-মনোরাজ্যে চিরকাল সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহাদেরই অর্জ্জিত পুণ্য-

ফলের প্রভাবে তাঁহাদেরই দূরতম বংশধরগণের সমীপে ব্রাহ্মণেতর বহুবিদ্যা ও বিত্তশালীব্যক্তি এখনও সংস্কারবশতঃ অবনত মস্তকে শুভাশীষ ভিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণের অবলম্বন সেই জ্ঞান সংযম শুচি ও নিষ্ঠার প্রভাব তারানাথের চরিত্রেও যথেষ্ট ছিল। এখন দেশের বড় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

কালনায় অবস্থিতির কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাচস্পতি মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। প্রথমে বাচস্পতি মহাশয় ঐ কর্ম্ম গ্রহণে আপত্তি করেন, বলেন যে, উহাতে তাঁহার ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাঘাত হইবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝাইয়া দেন যে কলিকাতাই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। কি বিদ্যালোচনা, কি ব্যবসায় বাণিজ্য সর্ব্বপ্রকারের সুবিধা এক কলিকাতাতেই হইতে পারে। তাহা ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আবশ্যকমত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে কলিকাতা পুনরায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইল। এখানে কলেজে অধ্যাপকতা, বাসায় বৈদেশিক ছাত্রগণের অধ্যাপনা ও অন্য সময়ে আপনার বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৮৪০ সাল হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। ১৮৬২ সালে তাঁহার ব্যবসায়ে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হইল। তিনি এ ক্ষতি পূরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হইল। এখন তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে পতিত হইল। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের সূচনা হইল।

কলিকাতায় আসার কিছুকাল পর হইতেই অদ্ভুদকর্ম্মা বাচস্পতি মহাশয় অন্যান্য শত কষ্টের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সহজবোধ্য সুন্দর সংস্করণের প্রচলনের চেষ্টা করিতেছিলেন। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রণ ও প্রচার এসম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রয়াস।

ইহার পর তিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর সরলা নাম্নী টীকাও এই সময়ে রচিত হয়। এই টীকা রচনা দ্বারা তিনি পাণিনীর ব্যাকরণ সহজবোধ্য করিয়া জগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। যেখানে সংস্কৃত ভাষায় আদর ও আলোচনা আছে সেখানে বাচস্পতি কৃত সরলানাম্নী টীকা সহিত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর আদর আছে। এতদিন অন্যান্য বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলন কার্য্যে সমগ্র মন দিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ব্যবসার ক্ষতি হওয়ার পর এবং তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাত্মা কাউয়েল সাহেবের সুপরামর্শে তিনি লুপ্তপ্রায় ধ্বংসোন্মুখ সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথি হইতে বিভিন্ন পাঠের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কোথাও বা পাঠোদ্ধার করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য অলঙ্কার, স্মৃতি সাঙ্খ্য, ন্যায় বেদ বেদান্ত প্রভৃতি তিনি মুদ্রণ ও প্রচার করিতে লাগিলেন। কেবল মূলগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত বিবেচনা না করায় ঐসকল গ্রন্থ সরল ও সহজ টীকা দ্বারা সুখবোধ্য করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষা সুগম ও প্রচারের জন্য তিনি এতাবৎ যাহা করিয়াছিলেন তাহাতেই জগতে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। সংস্কৃত শিক্ষিত সমাজে অমরতা লাভের জন্য তাঁহার ঐ সকল কার্য্যই যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল কীর্ত্তির অপেক্ষাও তাঁহার উজ্জ্বলতর কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। সেই অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহার বাচস্পত্য অভিধান।

বাচস্পত্য অভিধান সংস্কৃত ভাষায় মহাকোষ। ইংরজীতে "এন্‌-সাইক্লোপিডিয়াব্রিটানিকা" বলিলে আমরা যাহা বুঝি সংস্কৃত ভাষায় বাচস্পত্য অভিধান ও তাহাই। "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া" সংকলন একটী অতি বৃহদ্ব্যাপার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ইংরাজী মহাকোষের

সঙ্কলনের বিবরণে জানা যায় যে ঐ কার্য্যের জন্য রীতিমত আপিস গঠিত হইয়াছিল। সম্পাদক, সহকারী-সম্পাদক, সহায়ক, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ মহাকোষের বিভিন্ন বিষয় রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ বহু পণ্ডিত একত্র হইয়া একযোগে বহু বৎসর কার্য্য করিয়া ঐ বৃহদগ্রন্থ সম্পাদন করেন। ঐ পণ্ডিত সমাজের রচিত এবং বহু বিত্তশালী প্রকাশকের প্রচারিত গ্রন্থ দেখিয়া এক্ষণে আমরা বিস্মিত হইতেছি। কিন্তু বাচস্পত্য অভিধান সম্বন্ধে ঐরূপ কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। এই মহাগ্রন্থের সংক্ষেপ বর্ণনা দিলেও পাঠক উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। এই মহাগ্রন্থের আকার সম্বন্ধে এই বলিলেই হইবে যে চারি পৃষ্ঠা ব্যাপী ফরমার আকারে ৫৬০০ পৃষ্ঠায় ঐ মহাকোষ সমাপ্ত হইয়াছে। উহার জন্য ৮০০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। উহা সঙ্কলন করিতে অষ্টাদশ বৎসর সময় লাগে। দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী সময়ে উহার মুদ্রণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। ইহাতে লৌকিক ও বৈদিক শব্দাবলী উদাহরণের সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে আর্হত গৃহ্যসূত্র, চার্ব্বাক, ন্যায়, পাশুপত, পাণিনী, পাতঞ্জল, প্রত্যভিজ্ঞ, মাধ্ব, মীমাংসা, শৈব, শ্রৌত, যোগাচার, রাসেশ্বর, বৈভাষিক, বৈশেষিক বেদান্ত দর্শনের পারিভাষিক শব্দ নিয়মের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অলঙ্কার কল্প গণিত ও জ্যোতিষ, তন্ত্র বৈদ্যক, শিক্ষা, সঙ্গীত, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের ও অষ্টাদশ পুরণেরও অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ের বর্ণনা আছে। এই সকল বিবিধ বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ করাই অন্য যে কোন লোকের উদ্যম ও অর্থের এক প্রকার অসাধ্য। তাহার উপর এই সকল বিষয়ের মুদ্রিত অমুদ্রিত গ্রন্থরাজি স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করা ততোধিক দুঃসাধ্য। প্রথমতঃ তিনি এই কার্য্যের জন্য তাঁহার অনুগত কয়েক জন কৃতীছাত্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

কিন্তু তিনি সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় অদ্ভুত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি পরকীয় সাহায্য গ্রহণ না করিয়া একাকী এতাদৃশ মহাকোষ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। এতাদৃশ সর্ব্বশাস্ত্রসংগ্রহ সংস্কৃত বিদ্যার দর্পণ স্বরূপ মহাকোষের উপযুক্ত প্রশংসা বাদের প্রয়াস আমাদের মত ক্ষুদ্র জনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি "তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ"। এবং তজ্জন্য ক্ষীণ কণ্ঠে এবং কম্পিত করে, দেশীয় যুবকগণকে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি:—

সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত
এক মনে ডাক ভগবান
সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃ স্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।

যাঁহারা মানবচরিত্র বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহারা বলেন যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা মহচ্চরিত্রের একটী প্রধান লক্ষণ। মহাপুরুষগণ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝেন তাহা সুচারু রূপে করিতে সতত প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কারণ, যাহা করিবার যোগ্য তাহা ভাল করিয়া করাই উচিত। অবস্থা চক্রে পড়িয়া জীবনে যখন যে কার্য্যে করিতে হয়, তাহা, ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, সম্পূর্ণ যত্নের সহিত করা আবশ্যক। য়ুরোপীয় এবং মার্কিণ জাতির মধ্যে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ পাদরী

কেরী সাহেব এক সময়ে শ্রেষ্ঠ পাদুকাকার ছিলেন বলিয়া গৌরব করিতেন। মহামতি গারফিল্ড, মজুর, সূত্রধর, মাঝি, দ্বাররক্ষক, ঘড়িয়াল, শিক্ষক, ব্যবহারাজীব, সৈনিক এবং দেশপতির কর্ম্ম করেন। কিন্তু তিনি যখন যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া করিয়াছিলেন। ইহাই উন্নতির গূঢ় রহস্য। স্যর মথুস্বামী আর্য্যের জীবনচরিত আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার চরিত্রে এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভাব সুন্দররূপে দেখিতে পাই।

অবস্থা বিপাকে তাঁহাকে গ্রাম্যতহসীল আপিসে দ্বাদশবর্ষ বয়সে মাসিক এক টাকা বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কর্ম্ম সামান্য হইলেও তিনি সম্পূর্ণ যত্ন ও আগ্রহের সহিত তাহা করিতেন। যে কোন কর্ম্ম তাঁহার হাতে পড়ুক না কেন তিনি তাহা সুচারুরূপে এবং সর্ব্বাঙ্গীণ করিয়া সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। মথুস্বামীর জীবনচরিতে এসম্বন্ধে একটী গল্প আছে। গল্পটী এই:—তিনি যখন তহসীল আপিসে কার্য্য করেন, তখন সেই তহসীলদারের অধীন একস্থানে একটী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তহসীলদার এই সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া আপিসে আসিলেন এবং বাঁধ ভাঙ্গার সঠীক বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য দক্ষকর্ম্মচারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সময় সেরূপ কোন কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিল না। অগত্যা তহসীলদার বালক মথুস্বামীকে ঘটনাস্থলে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি অনিচ্ছার সহিত বালককে পাঠাইয়াছিলেন এবং যথাযথ সংবাদ পাইবেন বলিয়া তত আশাও করেন নাই। শেষে যথাসময়ে মথুস্বামী ঘটনাস্থল হইতে বাঁধভাঙ্গার সঠীক সংবাদ লইয়া আসিলেন। শুধু কয় হাত বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে বা কিরূপভাবে জলের বেগে নিকটস্থ পল্লীসমূহের অনিষ্ট হইতেছে এইরূপ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হয়েন নাই।

বাঁধ মেরামত করিবার জন্য দ্রব্যাদি নিকটস্থ কোন পল্লীতে পাওয়া যায় ঐ সংস্কার কার্য্যের জন্য কত লোকের প্রয়োজন এবং তাহা সেখানে সহজে পাওয়া যাইবে কিনা এসকল সংবাদ যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তহসীলদার, বালক মথুস্বামীর নিকট এরূপ সঠীক বৃত্তান্ত পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইহার পর মথুস্বামীর বর্ণিত বৃত্তান্তের সত্যাসত্য নিদ্ধারণের জন্য তিনি একজন দক্ষ কর্ম্মচারীকে সেখানে পাঠান। কর্ম্মচারী মথুস্বামীর লিখিত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ সত্য বলিলেন। তহসীলদার তদবধি বালকের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। তহসীলদার বুদ্ধিমান ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বালক মথুস্বামীর চরিত্রে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্নেহেরচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনি বালকটীর কিসে মঙ্গল হয় তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে মথুস্বামী ও নিজের অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। মথুস্বামী যে আপিসে কর্ম্ম করিতেন সেখানে মধ্যাহ্নে কোন কর্ম্ম হইতনা। ঐ অবসর সময়ে তিনি নিকটস্থ একটী সামান্য বিদ্যালয়ে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। সেখানে অল্প কয় দিনের মধ্যে ইংরাজী বর্ণমালা শিখিয়া লয়েন। তহসীলদার তাঁহার শিক্ষানুরাগ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তদবধি স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় একটী ঘটনা উপস্থিত হয়। তাহা হইতে মথুস্বামীর শিক্ষার সুযোগ ঘটিল। তহসীলদারের এক অল্পবয়স্ক ভাগিনেয় তাঁহার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে ছিল। একদিন তহসীলদার ভাগিনেয় ও মথুস্বামীকে একখানি প্রথম পাঠ ইংরাজী পুস্তক দিলেন এবং বলিলেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে কে এই পুস্তকের কতটুকু অভ্যাস পার দেখিব। সপ্তাহান্তে তহসীলদার দুজনার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং দেখিলেন ভাগিনেয় কয়েক পৃষ্ঠামাত্র পাঠ করিয়াছে কিন্তু মথুস্বামী

সমগ্র পুস্তকখানি শেষ করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই তহসীলদার মথুস্বামীর উপর স্নেহশীল ছিলেন এক্ষণে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার এই নূতন নিদর্শন পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং তদবধি তিনি মথুস্বামীকে সুশিক্ষা দিবার জন্য মনস্থ করিলেন। অতঃপর মথুস্বামী উদরান্নের জন্য যে এক টাকা বেতনের কর্ম্ম করিতেছিলেন তাহা ত্যাগ করিলেন। তহসীলদার প্রথমতঃ মথুস্বামীকে নাগপত্তমে পাদরীদের স্কুলে শিক্ষার জন্য পাঠাইলেন। মথুস্বামী অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার পাঠ শেষ করিলেন। তহসীলদার তাঁহাকে আরও উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজে পাঠাইলেন; এবং সেই সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ স্যর মাধব রাওকে একখানি অনুরোধ পত্র দিলেন। তাহাতে মথুস্বামীর শিক্ষার যাহাতে সুব্যবস্থা হয় তাহার কথাই ছিল। মথুস্বামীর অসাধারণ মেধা ও পাঠানুরাগ দেখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট, হইলেন। সকলেই তাঁহার সুশিক্ষার জন্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়েই মথুস্বামী সুবিখ্যাত পাউয়েল সাহেবের অনুগ্রহভাজন হয়েন। বাঙ্গলা প্রদেশে ডেভিড হেয়ার ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের সাহায্য করিয়া যেমন প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন মহাত্মা পাউয়েল সাহেব মান্দ্রাজ প্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের সহায়তা করিয়া তৎপ্রদেশবাসিগণের চির-কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। মহাত্মা হেয়ার যেমন বালকগণের সহিত মিশিতেন, মহাত্মা পাউয়েলও তদ্রূপ ছাত্রগণের সহিত মিশিতেন এবং তাহাদিগকে আপনার বাসায় লইয়া গিয়া শিক্ষা ও সদুপদেশ দিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রে এরূপভাবে মিলিত হইলে অশেষ কল্যাণ হয়। সুশিক্ষা ও সুনীতি প্রচার সহজ হয়। আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র প্রভাব কখনও বৃথা যায় না। মহাত্মা পাউয়েলের সৎগুণের প্রভাব মথুস্বামীর চরিত্রে

প্রতিভাত হয়। মহাত্মা পাউয়েল মথুস্বামীর মেধা দেখিয়া তাঁহাকে 'অদ্ভুত বালক' বলিতেন; এবং তাঁহার প্রতি একান্ত স্নেহশীল ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পর মথুস্বামীকে নিজের বাসায় লইয়া যাইতেন, সেখানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এমন কি তিনি কথন কথন স্বয়ং গাড়ী করিয়া মথুস্বামীকে তাঁহার বাসায় পঁহুছাইয়া দিতেন। মথুস্বামীও শিক্ষকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন। তিনি নানা পরীক্ষায় স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বহু পুরস্কার ও বৃত্তিলাভ করিতে লাগিলেন।

মথুস্বামী যথন মান্দ্রাজে শিক্ষালাভ করেন তথন ভারতবর্ষের কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই সময়ে ১৮৫৪ খৃঃ অঃ মান্দ্রাজে একটী শিক্ষাসমিতি পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। এই সমিতি, উৎকৃষ্ট ইংরাজী রচনার জন্য ৫০০৲ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। মথুস্বামী ঐ রচনার পরীক্ষা দেন। তাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি ঐ টাকা প্রাপ্ত হয়েন। মথুস্বামীর রচনা এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে একজন পরীক্ষক মুক্তকণ্ঠে মথুস্বামীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করেন। তাঁহার মতে মথুস্বামী য়ুরোপের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের গৌরবস্পর্দ্ধী হইবার উপযুক্ত। মথুস্বামী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর গভর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রশংসা পত্র পান। এইখানে তাঁহার পাঠ সমাপন হয়। ইহার পর তিনি ৬০৲ বেতনে শিক্ষকতা করেন। এই কর্ম্ম অল্পদিন করার পর তিনি তাঞ্জোরের কলেক্টারীতে মহাফেজের কর্ম্ম পান। ঐ কর্ম্মে তাঁহাকে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর স্যর আলেকজাণ্ডার আরবুথনট মথুস্বামীকে ১৫০৲ বেতনে ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। মথুস্বামী যথন যে কর্ম্ম

করিয়াছেন তখন তাহাতে ভূয়সী প্রশংসা পাইয়াছেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টরের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি শিক্ষাবিভাগের উন্নতি-কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হয়েন। মথুস্বামী চিরকাল উন্নতিপ্রয়াসী ছিলেন। সদুপায়ে সুযোগ মত নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে তিনি কখনও পশ্চাদপদ হইতেন না। তিনি যখন শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত, তখন মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ওকালতী পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। মথুস্বামী দেখিলেন ওকালতী করিলে তাঁহার অধিক আয় হইবে। এই আশায় তিনি পরীক্ষার জন্য আইন পাঠ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মথুস্বামী পরীক্ষা দিলেন। বহু পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি সুখ্যাতির সহিত আইন পাশ করিলেন। ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন। মথুস্বামী মুন্‌সেফের পদপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি নূতন কর্ম্মে সহসা যোগদিতে পারিলেন না। ডিরেক্‌টর সাহেব তাঁহাকে শিক্ষা-বিভাগ ত্যাগ করিয়া যাইতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুস্বামী শিক্ষাবিভাগে অল্প দিন কাজ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেন। মথুস্বামীর কর্ম্মদক্ষতা ও প্রশংসা এক্ষণে তাঁহার উন্নতির প্রতিবন্ধক হইল। যাহা হউক বিচারবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ডিরেক্‌টর সাহেব মথুস্বামীকে মুনসেফের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। মথুস্বামীর প্রধান প্রশংসার কথা এই যে তিনি যখন যে কর্ম্ম করিতেন তাহা সমগ্র প্রাণ মন দিয়া করিতেন। এই জন্য তাহার সকল কাজই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। তিনি যখন মুনসেফের কার্য্যে নিযুক্ত তখন একবার তাঞ্জোরের জজ সাহেব তাঁহার আপিস পরিদর্শন করেন। আপিসের কাগজ পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও জজ সাহেব কোন ত্রুটী দেখিতে পান নাই। শেষে মথুস্বামী

কিরূপে বিচার কার্য্য করেন দেখিবার জজ সাহেব মুন্‌সেফ মথুস্বামীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার বিচার পদ্ধতি দেখিয়া জজ সাহেব এতই সন্তুষ্ট হয়েন যে তিনি বলেন মথুস্বামী জজ হইবার উপযুক্ত পাত্র।

মথুস্বামী মুন্‌সেফের কার্য্য বেশী দিন করিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে তাঁহাকে ১৮৫৯ সালে ডেপুটী কলেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই কর্ম্মও তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রাজস্বের কর্ম্মে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। ফৌজদারী আইনও তিনি সুন্দররূপে বুঝিতেন। মথুস্বামীর বিচার কার্য্য দেখিয়া সুবিখ্যাত নর্টন সাহেব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। মথুস্বামী ৬ বৎসর কাল ডেপুটীকলেক্টারের কাজ করেন। পরে ১৮৬৫ সালে সদর আলার পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই কর্ম্ম ৪ বৎসর করার পর তিনি মান্দ্রাজের পুলিস মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি আইনের কূটতত্ত্ব সকল বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন। জ্ঞানার্জ্জনে ও পরীক্ষাদানে মথুস্বামী কখনও পশ্চাদপদ হইতেন না। ইংরাজের ব্যবহার-শাস্ত্র সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য তিনি জার্ম্মাণ ভাষা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মথুস্বামী চিরকাল অধ্যয়নশীল ছিলেন। পুলিসমাজিষ্ট্রেটের শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিয়া তিনি ক্লান্ত হইতেন না। তিনি মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিয়া যে সময় পাইতেন তাহাতে বি, এল, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গুরু কর্ম্মভার, বা বয়স কিছুই তাঁহার উদ্যমের সমক্ষে বিঘ্নরূপে দাঁড়াইতে পারে নাই। তিনি যশের সহিত বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। মথুস্বামীর উন্নতির পথে আর কোন বাধা রহিল না। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মান্দ্রাজ ছোট

আদালতের জজের পদে উন্নীত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি সি, আই, ই, উপাধি পান। মথুস্বামীর বিচার কার্য্যে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। ১৮৭৮ সালে মথুস্বামী আর্য্য হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান যিনি এক দিন সামান্য উদরান্নের জন্য গ্রাম্য হিসাব নবিশের নিকট এক টাকা বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তিনি আজ মান্দ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি! পুরাণে ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য তপস্যার কথা শুনা যায়। মথুস্বামী আর্য্যের পক্ষে লাভ ইন্দ্রত্বলাভের অপেক্ষা বড় কম নহে—এবং এজন্য তাঁহার জজিয়তি সাধনাও নিতান্ত সহজ ছিল না।

শ্যামাচরণ সরকারের জীবন বিচিত্র ঘটনাবলীতে পূর্ণ। শ্যামাচরণের পিতা হরনারায়ণ সরকার পূর্ণিয়ার রাণী ইন্দ্রাবতীর দেওয়ান ছিলেন। হরনারায়ণ সরকারের সৌভাগ্যের সময় শ্যামাচরণের জন্ম হয়। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর দেওয়ানপুত্র শ্যামাচরণ সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েন। হরনারায়ণ সরকার অতিশয় দানধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। দানধর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় ভিন্ন অর্থ সঞ্চয় তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। অন্যথা সাধারণের মত হইলে তিনি স্ত্রীপুত্রের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন। হরনারায়ণ ভগবানের কৃপায় একান্ত আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে জাহ্নবী তীরে যখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "হরনারায়ণ, স্ত্রাপুত্রের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছ?" তখন তিনি বলেন "ধর্ম্ম আছেন, ভগবান আছেন, যে ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই আমার পুত্রকে রক্ষা করিবেন।" ভগবানের উপর নির্ভরশীলতার উৎকৃষ্টতর পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

হরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পূর্ণিয়ায় তাঁহাদের যে সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণনগরের সন্নিকট মাম জোয়ানি গ্রামে আসিয়া স্বামীর পৈতৃক গৃহে বাস করেন। পূর্ণিয়ার সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ টাকা এবং কিছু অলঙ্কারাদি শ্যামাচরণের মাতার নিকট ছিল। ইহা দ্বারা ও রাজা বিজয়গোবিন্দ দত্ত মাসিক বৃত্তির সাহায্যেই বিধবা রমণী পুত্র কন্যা কয়টী প্রতিপালন করিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই বিধবার সম্বল চোরে লইয়া যায়। বিজয়-গোবিন্দের বৃত্তি কিছু কাল পরে বন্ধ হয়। যে শ্যামাচরণের শৈশবে সুখের সীমা ছিল না এখন বাল্যে তাঁহার অন্নকষ্ট উপস্থিত। দেও-নের পুত্র এখন বিধবার পুত্র—দুঃখে দারিদ্র্যে দিনপাত করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ যথন বালক তথন (লর্ড বেণ্টিকের আমলের পূর্ব্বে) পল্লীগ্রামে শিক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাহার উপর শ্যামাচরণ এক প্রকার অভিভাবক হীন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্যামাচরণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই, ব্যবস্থা করে কে ? যাহাহউক এই সময়ে একটী সুযোগ ঘটে। এবং সেই শুভক্ষণ হইতে শ্যামাচরণের জীবনের সাধনা আরম্ভ হয়।

কৃষ্ণনগরে হরচন্দ্র সরকারের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্যামাচরণের নিমন্ত্রণ হয়। শ্যামাচরণ যথা সময়ে আত্মীয়গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধাদির কয়দিন গোলমালে কাটিল। তাহার পর একদিন হরচন্দ্র অবসর সময়ে শ্যামাচরণের সাংসারিক অবস্থার কথা ও তাঁহার লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। হরচন্দ্র শ্যামাচরণের কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু তেমন বুদ্ধিমান বালক লেখাপড়া শিখিতে পাইতেছেনা জানিয়া ততোধিক দুঃখিত হইলেন। যাহাহউক, হরচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া শ্যামাচরণকে তাঁহার বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া

করিতে বলিলেন; এবং তাহার জন্য ব্যবস্থাও করিয়াদিলেন। তখন দেশে পার্সী লেখাপড়া চলিত ছিল। পার্সী শিখিলে জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা হইত। হরচন্দ্র এই সব বিবেচনা করিয়া শ্যামাচরণকে শ্রীনাথ লাহিড়ী নামক জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির নিকট লইয়া যান। ইনি পার্সী উত্তমরূপে জানিতেন। শ্যামাচরণ ইঁহার নিকট পার্সী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামাচরণ হরচন্দ্রের বাটীতে দুবেলা আহার পাইতেন মাত্র; শ্যামাচরণের জন্য ইহার অধিক আর কিছু করিবার ক্ষমতাও হরচন্দ্রের ছিলনা। হরচন্দ্রের বাটীতে বাস ও আহার এবং শ্রীনাথ লাহাড়ীর নিকট বিনা বেতনে পাঠের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু পাঠ্য পুস্তক ও রাত্রিতে পাঠের জন্য তৈলের পয়সা জুটিল না। হরচন্দ্রের বাটীতে শ্যামাচরণকে যে সংসারিক কার্য্যে সাহায্য করিতে না হইত এমন নহে। দিনের বেলা পাঠের অবসর কম মিলিত। যাহাদিগকে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে মানসিক উন্নতিলাভ করিতে হয় তাহাদিগের জন্য রাত্রি প্রশস্ত সময়। যখন অন্য সকলে নিদ্রাসুখে বিভোর তখন তাহারা কার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু দরিদ্র জন সে সময়েও আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারে না। আলোকের জন্য তৈলের আবশ্যক। তৈলের জন্য পয়সা আবশ্যক। দরিদ্র ব্যক্তি অনেক সময় সেই সামান্য পয়সাও সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্যামাচরণ পাঠ্যপুস্তক অনেক সময় অন্যের পুস্তক দৃষ্টে নকল করিয়া লইতেন; এবং রাত্রিতে পাঠের জন্য চৌধুরী বাবুদের বৈঠকখানায় যাইতেন। সেখানে সমস্ত রাত্রি আলোক থাকিত। শ্যামাচরণ সেই আলোকে পড়িতেন। এই রূপে তিনি কৃষ্ণনগরে থাকিয়া সাত বৎসর লেখা পড়া শিখেন। এত দিন বিধবা মাতা কোনরূপে পল্লীগ্রামে সংসার চালাইয়া ছিলেন। কিন্তু এখন আর চলে না। সুতরাং শ্যামা-চরণকে অর্থের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। শ্যামাচরণ পিতৃবন্ধু

রিড্ সাহেবের কথা স্মরণ করিলেন। রিড্ সাহেব তখন কলিকাতা খিদিরপুরে থাকিতেন। শ্যামাচরণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রিড্ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার অধীনে দশ টাকা বেতনে একটী মুহুরীর কর্ম্ম দিলেন। শ্যামাচরণ ভাবিলেন দুঃখের দিন বুঝি অবসান হইল। উপার্জ্জিত অর্থে মাতার সাহায্য করিতে পারিবেন ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সে আনন্দ তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার কর্ম্ম গ্রহণের এক বৎসর কালের মধ্যেই রিড্ সাহেব ও তাঁহার অপর একজন কর্ম্মচারীর সহিত মোকদ্দমা হয়। তাহাতে শ্যামাচরণকে প্রভুর পক্ষে সাক্ষী দিবার কথা হয়। কিন্তু মোকদ্দমায় প্রভুই অপরাধী ছিলেন। এক্ষেত্রে পাছে চাকরীর অনুরোধে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হয়েন এই ভয়ে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলেন। মিথ্যা-সাক্ষী দেওয়া অপেক্ষা দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করা তিনি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। শ্যামাচরণ পুনরায় কষ্টে পড়িলেন; কলিকাতার মত নগরে সহায় সম্পত্তি হীন হইয়া কোথায় যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। শেষে কৃষ্ণনগরের পরিচিত বন্ধু সত্যপরায়ণ রামতনু লাহাড়ীর বাসায় যাওয়াই স্থির করিলেন। রামতনু লাহিড়ী ও তাঁহার দুটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন পটলডাঙ্গায় বাসা করিয়া থাকেন ও হিন্দুকলেজে পড়েন। রামতনু শ্যামাচরণকে সাদরে বাসায় স্থান দিলেন। লাহিড়ীদের বাসায় দাসদাসী বা পাচকের কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। বাসায় পাক করা, বাজার করা, জল আনা প্রভৃতি কর্ম্ম তাঁহারা সকলে মিলিয়া করিতেন। বাসার কার্য্যের শ্রমবিভাগে শ্যামাচরণের উপর গোলদীঘি হইতে জল আনার ভার ছিল। শ্যামাচরণ শারীরিক পরিশ্রমে কখনও কাতর বা লজ্জিত হইতেন না। ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছিল।

লাহিড়ীদের বাসায় অবস্থান কালে তিনি আপনার চেষ্টায় ও বন্ধুবর্গের সাহায্যে সাহেবদিগকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই অর্জ্জিত অর্থ হইতে তিনি মা ও ভাগিনী দুইটীর ভরণপোষণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই কর্ম্মে তাঁহার মাসিক ত্রিশ টাকা আয় হইল। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা চির-কালই প্রবল ছিল। তিনি ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। প্রথমে স্বনাম প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের নিকট তিনি ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার পর ভাল করিয়া ইংরাজী ভাষা শিখিবার মানসে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইতে যান। কিন্তু তাঁহার বয়স বেশী হওয়ায় তিনি সেখানে ভর্ত্তি হইতে পারিলেন না। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর। শ্যামাচরণ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভগ্নোদ্যম হইবার পাত্র ছিলেন না। শ্যামাচরণ সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে প্রাতে পড়িবার বন্দো-বস্ত করিলেন। এবং আপনার সেই সামন্য ত্রিশ টাকা হইতে মাসিক আট টাকা বেতন দিয়া তিনি ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সাহেব অধ্যাপকগণের নিকট তিনি ইংরাজী ছাড়া, গ্রীক, লাটীন ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময়ে শ্যামাচরণ মাদ্রাসায় একটী স্থায়ী কর্ম্ম পান। কর্ম্মটীর ২৫৲ টাকা বেতন। কালে-জের অধ্যাপক শ্যামাচরণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতন ৪০৲ টাকা করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার পাঠানুরাগ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হয়েন এবং তাঁহার পাঠের সুবিধার জন্য মাদ্রাসায় প্রাতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সাহেবদের কৃপায় শ্যামাচরণের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

শ্যামাচরণের জীবনের এই সময়ের ইতিহাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের

কাহিনীতে পূর্ণ। তাঁহার পরিশ্রম ও কর্ম্মসহিষ্ণুতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কথিত আছে এইসময়ে তিনি প্রাতে ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। তাহার পর অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে পাঠ করিতেন। ইহার পর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিতেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার দুসন্ধ্যা যথারীতি আহার হইত না। অতি প্রত্যুষে রন্ধন করিয়া আহার করিয়া মাদ্রাসায় যাওয়া সুবিধা হইত না। এইজন্য তিনি রাত্রিতে পড়াইয়া আসিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং প্রাতের জন্য রুটী তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। প্রাতে সেই রুটীই তাঁহার প্রধান আহার ছিল। এইরূপে তিনি পাঁচ বৎসর অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করেন। এইখানে বলা আবশ্যক যে রামতনু বাবুদের বাসায় দুইবৎসর অবস্থানের পর শ্যামাচরণের অবস্থা একটু সচ্ছল হইলে তিনি ঠনঠনিয়া স্বতন্ত্র বাসা করেন। মাদ্রাসায় পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর তিনি সংস্কৃত কালেজে ৭০৲ বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হয়েন। মাদ্রাসায় কর্ম্ম করিবার কালে তথাকার সুশিক্ষিত মৌলভীগণের সাহায্যে তিনি তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত আরবী পারসী ও উর্দ্দূ ভাষার জ্ঞান বর্দ্ধিত করেন। এখন আবার সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায়গণের সংসর্গে আসিয়া তিনি আপনাকে পরমসৌভাগ্যবান বিবেচনা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি অল্প সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি হয় নাই। এক্ষণে তিনি জয়নারয়ণ তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণের নিকট স্মৃতি শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। বিবিধ ভাষায় ও বহু শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য শ্যামাচরণের সাধনার এইখানে

এক প্রকার শেষ হয়। ইহার পর আমরা তাঁহাকে অপরত্র ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে রত দেখিব।

শ্যামাচরণের নির্ম্মল চরিত্র, বহুভাষাজ্ঞান অসাধারণ শ্রমশীলতার জন্য তিনি শিক্ষাবিভাগের লোকের প্রশংসা ভাজন হইলেন। এই সময়ে তিনি ব্যবহারাজীবী হইবার জন্য ইচ্ছা করেন। কিন্তু ভাগ্যদেতার কোন অজ্ঞাত নির্দ্দেশে তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই। যাহা হউক শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর সুপারিসে শ্যামাচরণ তদানীন্তন সদর আদালতের প্রধান বিচারপতির অধীনে পেশকারের কর্ম্ম পাইলেন এই পদের বেতন ১০০৲ টাকা। শ্যামাচরণ এতদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছিলেন। আপিস আদালতের কর্ম্মের কোন জ্ঞান তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাকে কোন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সম্মুখে পেশকারের কর্ম্মের নূতনত্ব বেশীদিন রহিল না। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নূতন কর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিলেন। এতাবৎকাল যেরূপ পদ্ধতিতে পেশকারের সাহায্যে বিচারকগণ মোকদ্দমার কাগজপত্র বুঝিতেন তাহাতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে অযথা অনেক সময় লাগিত। শ্যামাচরণের উপরিতন কর্ম্মচারী সাহেব, কি উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র শীঘ্র মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারা যায় তাহা জিজ্ঞাসা করেন। এই উপলক্ষে শ্যামাচরণ মোকদ্দমার কাগজপত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া সাহেবকে দেন। মোকদ্দমা সংক্রান্ত দেশীয় ভাষায় লিখিত কাগজপত্রের সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ পাইয়া সাহেব অতি সহজে সুবিচার করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে সদর আদালতের জজগণ এইপ্রকার অনুবাদ প্রথার উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের সমর্থনে তদাদীন্তন

বড়লাট লর্ড ড্যালহৌসী ৪০০৲ টাকা বেতনে আদালতে একজন অনুবাদক নিযুক্ত করিতে অনুমতি দেন। এই নূতন কর্ম্মে শ্যামাচরণ প্রথমে নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে তদবধি সমস্ত জেলা আদালতে এক একজন অনুবাদক নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয়। অনুবাদকের পদ হইতে ক্রমে শ্যামাচরণ সদর অদালতের প্রধান দ্বিভাষীর পদে উন্নীত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে এইকর্ম্মে কোন দেশীয় লোক নিযুক্ত হয়েন নাই। শ্যামাচরণ বিষম প্রতিযোগিতার মধ্য হইতে এই পদ লাভ করেন। কঠোর সাধনাদ্বারা তিনি সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়কেই প্রীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৮৭৩ খৃঃ অঃ শ্যামাচরণ সরকারী কার্য্য হইতে ৩০০৲ টাকা পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যে উৎকট সাধনা করিয়াছিলেন ভগবানের কৃপায় তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের জীবনের সাধন প্রসঙ্গ মুখ্যতঃ এইখানে শেষ।

আমাদের জাতীয় বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল মহাত্মা দেহমন ক্ষয় করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত এক জন। বাঙ্গালা ভাষাকে তেজস্বিনী করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়া অক্ষয় কুমার বঙ্গদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের সাহিত্য ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। দর্শন বিজ্ঞান কিংবা কোনপ্রকার গম্ভীর বিষয়ের উপযুক্ত শব্দের অভাব বাঙ্গালা ভাষায় পরিলক্ষিত হইত। অক্ষয়কুমার আত্মপ্রাণ দিয়া বঙ্গভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় উন্নতি তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, তিনি শৈশবকাল হইতে জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। এবং আজীবন কাল সেই

জ্ঞানলাভ ও স্বদেশে তাহার বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের অসাধারণ সাধন প্রসঙ্গের আভাস পাইতে হইলে তাঁহার জীবনের স্থূল স্থূল কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করা আবশ্যক। সেই ঘটনার পরম্পরা হইতে তাঁহার সাধনার কঠোরত্ব বুঝিতে পারিব।

অক্ষয়কুমারের শৈশবকালে দেশের শিক্ষাপ্রণালী অন্যরূপ ছিল। তখন আদালতে সরকারী কাছারীতে পারসীর প্রচলন সমধিক ছিল। চাকরী ব্যবসায়ী কায়স্থসন্তান যাহাতে কোন ভাল কর্ম্ম পান সেই আশায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রথমে পারসী পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সময়ে দেশে অল্পে অল্পে ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা হইতেছে। কিন্তু তৎকালে ইংরাজী শিক্ষা প্রায়ই পাদরী সাহেবদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এবং যাহারা পাদরীদের নিকট পড়িত, তাহাদের মধ্যে অনেকে সমাজদ্রোহী, আচার ভ্রষ্ট বা খ্রীষ্টান হওয়াতে সাধারণ লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ইংরাজী শিখিলেই যুবকেরা খ্রীষ্টান হইবে অথবা সমাজদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল বা আচারভ্রষ্ট হইবে, সন্ধ্যাতর্পণ সকলই ত্যাগ করিবে। পিতৃপুরুষগণ পিণ্ড জল পাইবেন না। এই সংস্কার থাকায় অক্ষয়কুমারের পিতা তাঁহাকে প্রথমে ইংরাজী শিখিতে দিতে সাহস করেন নাই। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় চলিত প্রথা ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি পিতার সংস্কার অক্ষয়কুমারের সুশিক্ষার প্রবল অন্তরায় হইয়াছিল। কিরূপে তিনি নিজের চেষ্টায় এই বাধা অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। অক্ষয়কুমারের মন শৈশবকাল হইতে অনুসন্ধিৎসু ছিল। তত্ত্বজিজ্ঞাসু বালকের বিবিধ প্রশ্নে গ্রাম্য গুরুমহাশয় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। তিনি অক্ষয়কুমারের "বাজে কথায়" কাণ না দিয়া তাঁহাকে দলিল দস্তাবেজ আরজি, পাট্টা, কোবলা লেখার

পদ্ধতি, শুভঙ্করীর মনসাঙ্কের প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে বলিতেন। অক্ষয়কুমারের জ্ঞানের তৃষ্ণা ইহাতে মিটিত না। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকাদি পাইলে তিনি আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। এই অবস্থায় পিয়ার্সন সাহেবের অনুবাদিত বাঙ্গালা ভূগোল তাঁহার হস্তে আসে। পাঠান্তে অক্ষয়কুমার আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। পৃথিবীর আকার ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে পৌরাণিক যে সকল ধারণা ছিল, তাহা দূর হইল। তিনি সেই অল্পবয়সেই বুঝিলেন ইংরাজী ভাষা কি অনন্ত রত্নের আকর। তদবধি তিনি ইংরাজী শিক্ষার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পিতা ও অপরাপর কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া বলাতে এবং তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করাতে তাঁহারা অক্ষয়কুমারকে কোন পাদরীর স্কুলে ভর্ত্তি হইতে অনুমতি দেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার পাঠ বেশী দিন হয় নাই। মিশনরী স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি আড়াই বৎসর কাল মাত্র গৌরমোহন আঢ্যের সুবিখ্যাত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঠ করেন। বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ তাঁহার এই পর্য্যন্ত। এই সময় তাঁহার বয়স সতর আঠার বৎসর হইবে। সাংসারিক নানা দুর্ঘটনায় বিদ্যাণয়ে তাঁহার শিক্ষা লাভ ঘটিল না সত্য, কিন্তু যে অল্প সময় তিনি বিদ্যালয়ে ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার জ্ঞানের প্রতি এরূপ অনুরাগ জন্মে যে ভবিষ্যত জীবনে নানা দুঃখে কষ্টে, সুখে সম্পদে বা রোগে শোকে কিছুতেই তাহা কমে নাই। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি বিদ্যালয়ে শিক্ষার একটী অন্যতম উদ্দেশ্য। কিরূপে জ্ঞানান্বেষণ করিতে হয়, কিপ্রকারে স্বাধীনভাবে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় এ সকল কথা বিদ্যালয়ে সুশিক্ষক শিখাইয়া দেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি ঐ দুটী তাহাদের অন্যতম হয়, তবে অক্ষয়কুমারের স্বল্পকাল ব্যাপী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন নিশ্চয়ই সার্থক হইয়াছিল।

উত্তরজীবনে তিনি জ্ঞান পিপাসাতৃপ্ত করিবার জন্য যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণের শিক্ষার বিষয়। অধুনা দেখা যায় আমাদের দেশের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রায়ই পুস্তক স্পর্শ করেন না। এইজন্য বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণের শিক্ষার অসারত্বের এত নিন্দা শুনা যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া স্বাধীন ভাবে পাঠ ও চিন্তা আমাদের দেশে এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য আমাদের দেশে শিল্প বিজ্ঞান বা সাহিত্যক্ষেত্রে মৌলিক কার্য্য অতি বিরল।* অনেকে বলেন যে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য শিক্ষিত উপাধিধারী যুবকগণের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে আমাদের দেশের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন ত্যাগ করেন আর ইয়ুরোপীয় ও মার্কিণ যুবকগণ উপাধি গ্রহণান্তর যথারীতি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কথাটী খুব সত্য। অক্ষয়কুমার যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল তাঁহার বিদ্যালয় ত্যাগের পর স্বাধীন পাঠ ও স্বাধীন চিন্তার বলে।

যে অবস্থাবিপাকে পড়িয়া তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন তাহা প্রায় সচরাচর লোকের ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেইরূপ দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়া আত্মোন্নতির জন্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য, বাঙ্গালী সমাজের জন্য অক্ষয়কুমার যাহা করিয়াছিলেন তাহা সচরাচর লোকে করে না। অন্যথা আমরা অনেক অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম। অক্ষয়-

* সুখের বিষয় আমাদের সুযোগ্য রাজপুরুষগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অভাব দূরীকরণের জন্য রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী, এম, এ, এম, ডি, ও এম, ই, উপাধি ধারিগণের মৌলিক গবেষণাদির জন্য নূতন নিয়ম ও বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আশা করা যায় কালে ইহাতে দেশের কল্যাণ হইবে।

কুমারের বয়স যখন ১৭।১৮ বৎসর, তখন তাঁহার স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িয়াছিল। তিনি নানা স্থানে চাকরীর জন্য ঘুরিয়াছিলেন। সহায়বিহীন হইয়া অভাবের গুরুভার শিরে লইয়া উমেদারী করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই অবস্থায় যুবকগণ জীবনে যত অবসাদ অনুভব করে অন্য সময় বোধ হয় তত করে না। তাহারা শিক্ষামন্দিরে একটা নিশ্চয়তার মধ্যে আশান্বিত থাকে। সংসারের যে চিত্র পঠদ্দশায় অঙ্কিত করিয়া থাকে বিদ্যালয় ত্যাগের পর যুবকগণ তাহা কদাচিৎ দেখিতে পায়। এইখানেই ত পার্থক্য। তাহার পর সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন, সাংসারিক ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রায়ই পাওয়া যায় না। প্রতিযোগিতা সেখানে অত্যন্ত বেশী, তাহা ছাড়া ঈর্ষ্যা দ্বেষ অসূয়া অন্যায়াচরণ প্রভৃতির ত কথাই নাই। অক্ষয়কুমার এসকল উপদ্রব ও অসুবিধার বাহিরে ছিলেন না। তিনি দৈনিক পরিশ্রমের পর যখনই অবসর পাইতেন তখনই দেবী সরস্বতীর আরাধনা করিতেন। প্রকৃত ভক্তের ভক্তি ও নিষ্ঠা ও আগ্রহের সহিত তিনি বিদ্যাচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি পরকীয় সাহায্য ব্যতিরেকে, একমাত্র স্বাবলম্বনের গুণে বহুবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়েন। বিদ্যালয় ত্যাগের কিছুকাল পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় আট টাকা বেতনের শিক্ষকতার কার্য্য পান। কর্ম্মটী অল্প বেতনের হইলেও উহা তাঁহার পক্ষে যেমন উপস্থিত তীব্র অভাব প্রশমনের উপায় হইয়াছিল তেমনই উহা তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের উন্নতি সৌধ সোপানের প্রথম স্তর হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার সংস্রবে আসিয়া তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পণ্ডিতের কার্য্য তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই ঐ পত্রিকার সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্যা অর্জ্জন ও বিদ্যা দান করা তাঁহার

জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বাল্যে এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সমধিক সুবিধা ও সুযোগ ঘটেনাই। যৌবনের প্রারম্ভে অন্নচিন্তায় সততক্লিষ্ট থাকিলেও তিনি অবসর পাইলেই বিদ্যালোচনা করিতেন। ইহার পর তত্ত্ববোধিনী সমাজের আশ্রয় পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আর অন্নচিন্তায় মুহ্যমান থাকিতে হইত না। সুতরাং এক্ষণে তিনি একান্ত চিত্তে জ্ঞান সাধনায় রত হইলেন। পুস্তকাদির আর তাঁহার অভাব রহিল না। রুচি অনুযায়ী সর্ব্ববিধ পুস্তক প্রচুর পরিমাণে পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অক্ষয়কুমার ইংরাজী দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান বিশেষ রূপে আলোচনা করেন। অধিক কি রসায়ন উদ্ভিদ বিদ্যা সম্যক রূপে শিক্ষা করিবার মানসে তিনি দুই বৎসর কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ মেডিকেল কলেজে ছাত্রের ন্যায় অধ্যাপকগণের নিকট ঐ দুই বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তিনি এক্ষণে অহোরাত্র অবিশ্রান্ত লিখন পঠনে ব্যস্ত রহিলেন। এইরূপে তিনি দ্বাদশ বর্ষকাল সাধনা করেন। ইহার পর তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। দৈহিক ক্ষুধার ন্যায় মানসিক ক্ষুধা আছে। শারীরিক শক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উভয়বিধ ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করা উচিত। শরীরকে উপেক্ষা করিয়া মনের উন্নতি কিম্বা মনকে উপেক্ষা করিয়া শারীরিক উন্নতি করিতে গিয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে, প্রকৃতির প্রতিকূলে যাইলে, প্রকৃতি প্রতিশোধ লইয়া থাকে। অক্ষয়কুমার সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। তিনি শরীর ও মনকে অতিমাত্রায় খাটাইয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে দুরারোগ্য শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার ৬৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ৩১ বৎসর কাল ঐ কষ্টদায়ক পীড়ায় জীবন্মৃত হইয়া কাটাইয়া ছিলেন। কিন্তু

আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন অনেকে সুস্থদেহে সুস্থমনে তাহা করিতে পারেন না। ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক দুই খণ্ড বৃহৎগ্রন্থ তাঁহার পীড়িত অবস্থায় রচিত। অবশ্য এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের অনেকাংশ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন ঐ সকল একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন তিনি শিরোরোগে পীড়িত। ঐ রূপ অবস্থায় গ্রন্থখানিকে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইলে কিরূপ আগ্রহ সঙ্কল্প ও সাধনার প্রয়োজন তাহা যাঁহারা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা বুঝিতে পারেন। কিরূপ অবস্থায় ও কতকষ্টে ঐ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের দুই খণ্ড রচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। "শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা কি বলিব? না লিখন না পঠন না চিন্তন না গ্রন্থ শ্রবণ কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক কষ্ট হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এভাগের কি রচনা কি শোধন কি মুদ্রাঙ্কন যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটিবার ও নেত্রপাত করিতে করিতে পারি নাই। অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাব সম্বলিত চিন্তাপ্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকেনা। কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশ্যে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা স্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয় ততক্ষণ মস্তকমধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে লিখিয়া রাখিতে

বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে যান-বাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধু বিশেষের সমীপে গমন পূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার ষত্ব ণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্য্যমানে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দ্ধ রাত্রের নিদ্রাকাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে, নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া, সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভবনা থাকিতনা। মনোমধ্যে এই রূপ কোন বিষয়ের উদয়ে ও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট; নিজে দূরে থাকুক, অন্য দ্বারা তাহা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট। এবং যে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদাপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশে কোন গ্রন্থাদি অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনেও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হই? শরীরের অবস্থা অনুসারে দিন বিশেষে ও সময় বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পঙ্ক্তি, কখন দুই চারি পঙ্ক্তি, দুই চারিটী বা দুই একটী শব্দ মাত্র, কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া উপাসক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদায় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পরপর লিখিত হয় পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন বাক্যটী কোন স্থানে বা কোন বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে উক্ত রূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময় তাহার কিছুই স্থির থাকেনা। সে সমুদয় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট। পূর্ব্বোক্ত রূপে শরীরের অবস্থানুসারে দিন বিশেষে ও সময়বিশেষে তখন ঔষধ-

বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানা রূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহুকষ্টে কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।" * রচিত গ্রন্থের আকার ও বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব ও পারিপাট্যের আর রচয়িতার দুরারোগ্য নিরতিশয় কষ্টদায়ক পীড়ার বিষয় যখন চিন্তা করা যায় তখন অক্ষয়কুমারের ইচ্ছা শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। ধন্য তাঁহার সঙ্কল্প আর ধন্য তাঁহার সাধনা।

বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত আলোচনা করিলে, সাহিত্যসাধনায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অত্যধিক প্রবণতা দেখা যায়। পরধর্ম্ম গ্রহণ, পরকীয় বেশ পরিধান, পিতামাতা ও সমাজত্যাগ ইত্যাদি অনেকগুলি ভুল তিনি করিয়াছিলেন। এগুলি তাঁহার অনিয়ন্ত্রিতা বিপথগামিনী ইচ্ছাশক্তির পরিচয় মাত্র। আমরা মধুসূদনের সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিব না। তাহার আবশ্যকই নাই। মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের কথা আলোচনা করিব। এবং দেখিব সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কিরূপ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি ইচ্ছাকে (ঈপ্সা) পর্ব্বত দুহিতা নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক তুলনাটী বড়ই মনোজ্ঞ।

মধুসূদন স্বয়ংও বলিয়াছেন—

—পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?"

সেই স্রোতস্বিনী সম্মুখে বাধা পাইলে কোথাও পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও বা তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভীমকান্ত জলপ্রপাত

* [ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা ২৭৫ ও ২৭৬ পৃঃ]

সৃষ্টি করিয়া অবিরাম গতিতে পুনরায় প্রবাহিত হয়। মধুসূদনের অনন্তরত্নপ্রভব শিরোদেশ হইতে উদ্ভব ইচ্ছাশক্তি সাহিত্যের উদ্দেশে যাইবার সময় এইরূপে কোথাও বাধা সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে কোথাও বা প্রবল বাধা পাইয়া পার্শ্বদিয়া গিয়াছে কোথায়ও বা প্রবলতর বাধা পাইয়া ক্ষণিকের জন্য স্থির হইয়া, শক্তিসঞ্চয় করিয়া বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সুন্দর সুন্দর খণ্ডকাব্য মহাকাব্যরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ চিত্তরঞ্জন জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন আজীবন দেবী সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। কিরূপ মহীয়সী সাধনা দ্বারা তাঁহার প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমে বলিতেছি।

মধুসূদন জন্মদাতা দত্তমহামতি রাজনারায়ণ এবং জননী জাহ্নবীর একমাত্র আদরের সন্তান। যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে রাজনারায়ণ দত্ত সঙ্গতিপন্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পল্লীগ্রামের বিষয় বিভব ছাড়া ইনি কলিকাতার সেকালের সদর আদালতের একজন বিশিষ্ট উকীল ছিলেন এবং ওকালতী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। মধুসূদনের জননী জাহ্নবীও সম্ভ্রান্তপরিবারের দুহিতা ছিলেন। এমন পিতা মাতার একমাত্র পুত্র যে অতিশয় আদরের হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? মধুসূদন দ্বাদশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাগরদাঁড়ীতে ছিলেন। সেইখানে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করেন। যে বয়সে ও যেরূপ আদর পাইলে ধনীর সন্তান "আলালের ঘরের দুলাল" হইয়া লেখা পড়া করেনা মধুসূদন সেই বয়সে সেইরূপ অথবা তাহার অপেক্ষা অধিক আদর পাইয়া একদিনের জন্য লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার ঐকান্তিক বিদ্যানুরাগ ও অলৌকিক প্রতিভা এবং প্রখরা স্মৃতিশক্তির জন্য তিনি পাঠদ্দশায় সর্ব্বত্র

শিক্ষকের স্নেহ ও প্রশংসার পাত্র ছিলেন। গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের তাড়না বেত্রদণ্ড, 'ইটেথাড়া' 'জলবিছুটী' অন্যান্ত সহপাঠিগণের বিদ্যালাভের প্রতি ভীতি বা বৈরাগ্যের কারণ হইলেও মধুসূদন ঐ সকল কারণে কোনও দিন পাঠশালায় অনুপস্থিত হইতেন না বা অনিচ্ছায় গমন করিতেন না। অধিকন্তু শুনা যায় তিনি আহারান্তে সর্ব্বাগ্রে পাঠ-শালায় উপস্থিতহইবার মানসে "ক্ষীর সর ননী" প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদ খাদ্য এবং ঐসকল আহারের জন্য পুত্রবৎসলা জননীর সস্নেহ আহ্বান উপেক্ষাকরিতেন। শৈশবে মধুসূদনের পাঠানুরাগ এমনই প্রবল ছিল। ইহার পর তাহার যখন ত্রয়োদশ বৎসর বয়স তখন তিনি কলিকাতায় আসেন এবং খিদিরপুরে পিতার নিকট থাকিয়া কিছু দিন খিদিরপুরের কোন স্কুলে পড়েন এবং পরে হিন্দুকলেজে প্রেরিত হয়েন। ১৮৩৭ সাল হইতে ১৮৪২ সাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি ইংরাজী বর্ণমালা হইতে সিনিয়র বিভাগের শেষ পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পাঠ করেন। মধুসূদনের পঠদ্দশায় এখনকার ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপাধিপরীক্ষা ছিল না। তবে শুনা যায় যে সিনিয়র বিভাগের শেষ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকগুলি বর্ত্তমান সময়ের বি, এ, কোর্সের সমতুল্য ছিল। ছয় বৎসরে ইংরাজীর এ, বি, সি, হইতে আরম্ভ করিয়া বি, এ, কোর্স পর্য্যন্ত প্রশংসার সহিত অধ্যয়ন করার কথা শুনিলে এখন আমাদের বিস্ময় জন্মে। স্বতঃই কয়েকটী প্রশ্ন মনে হয়—তখনকার শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ ছিল, শিক্ষকগণই বা কেমন ছিলেন, আর যে ছাত্র এইরূপ পাঠ সমাপন করিতে পারেন তাঁহার মেধা ও সাধনা কিরূপ ছিল? একে একে একথাগুলির আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষাপ্রণালী কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া অলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা 'পরীক্ষা-

প্রধান'। পরীক্ষকের প্রশ্নগুলির কিয়দংশের উত্তর দিতে পারিলে এখন পারদর্শী বলিয়া প্রশংসা পাওয়া যায়। পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষা-প্রণালীর মূলোদ্দেশ্য হিতকর হইলেও কালে তাহার অপব্যবহার হইতেছে। শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষাপ্রধান হওয়াতে প্রশ্নোত্তরের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্র দেখেন যে, কোন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক বিশেষে কত প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে। এই সকল প্রশ্নের অধিক সংখ্যকের উত্তর দিতে পারিলেই পরীক্ষায় পাশ হওয়া যায় এবং প্রশংসা পাওয়ার সম্ভবনা অধিক। এই বিবেচনায় শিক্ষক ও ছাত্র পুস্তক অধ্যাপন ও অধ্যয়ন কালে প্রশ্নোপযোগী অংশ গুলি পেন্সিল দ্বারা চিহ্নিত করিয়া যান। এবং সেই সকল অংশই শুকের ন্যায় ছাত্রেরা কণ্ঠস্থ করেন। বর্ত্তমান সময়ে সম্ভাবিত প্রশ্ন নির্ব্বাচন কৃতী শিক্ষকের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ছাত্রগণ পরীক্ষা মন্দিরে কণ্ঠস্থবিদ্যা উত্তরের কাগজে উদ্গীরণ করিয়া আসেন। অনেকে এইরূপ কার্য্যকে বমন ক্রিয়ার সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা বলেন যেমন খাদ্য দ্রব্যের পরিপাক হওয়া আবশ্যক অন্যথা বলাধান হয় না সেইরূপ অধীত বিদ্যা চিন্তার দ্বারা আত্মগত না করিলে বিদ্বান হওয়া যায় না। ভুক্ত দ্রব্যের বমন ও কণ্ঠস্থ বিদ্যার আবৃত্তি উভয়ের তুল্য মূল্য। উপমাটী কাহার কাহার নিকট ন্যক্কার জনক বোধ হইলেও উহা যে এক বারে অসত্য বা অসঙ্গত তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকের প্রশ্ননির্ব্বাচনের সাহায্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস ত আছেই। তাহা ছাড়া বাহিরে অর্থপুস্তক "আদর্শ-প্রশ্নোত্তর" ইত্যাদির প্রভাবও কম নহে। অর্থপুস্তক রচয়িতা অর্থপুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিশ্রম সার্থক করেন সত্য, কিন্তু প্রায় স্থলেই ঐ প্রকার বহু অর্থপুস্তক ক্রয় করিয়া কত ছাত্রের কত যে অনর্থ ঘটিতেছে

তাহার ইয়ত্তা কে করিয়াছে? বাস্তবিক ব্যাখ্যা পুস্তকের বাহুল্যে মূল বিষয়ের আলোচনা কমিয়াছে। একজন সুলেখক বলেন যে ব্যাখ্যা-পুস্তকগুলি দেবগৃহের ধুমোদ্গারী প্রদীপের ন্যায়; উহাতে আলোকের অপেক্ষা ধুমোদ্গার হেতু অন্ধকারই বেশী হয়। বিগ্রহের মূর্ত্তি কদাচিত দৃষ্টি গোচর হয়। বাস্তবিক ঐ প্রকার ব্যাখ্যাপুস্তক ও টীকা টীপ্পনীর সাহায্যে বাগ্‌দেবীর অমল ধবল কান্তি কদাচিৎ দৃষ্টি গোচর হইয়াথাকে। সরল ভাষায় বলিতে গেলে, নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্নোত্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অধ্যয়ন করায় স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তা কমিতেছে, জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অনুরাগ কদাচিৎ বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা হউক সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের সুযোগ্য রাজপুরুষগণ এবং স্বদেশ হিতৈষী চিন্তাশীল বিদ্বৎ সমাজ দেশের শিক্ষার এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।*

মধুসূদন দত্ত যখন হিন্দু কালেজে শিক্ষা লাভ করিতে ছিলেন তখন দেশের শিক্ষা প্রণালী অন্যরূপ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন এত পরীক্ষা ভীতি ছিল না। ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকগণ সতত প্রয়াস পাইতেন। তাঁহারা ছাত্রগণের চিন্তাশক্তি, ভাবগ্রাহিতা এবং রসজ্ঞতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি এবং রাজনীতির দোষগুণ ছাত্রগণের সহিত বিচার করিয়া ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তি পারিমার্জ্জিত করিতেন। এবং ঐ সকল বিষয়ের শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় অংশ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। সেই সকল সুশিক্ষকগণ

---

* মহাত্মা লর্ড রিপণের এডুকেশন কমিশন, শ্রীযুক্ত পেডলার সাহেবের নূতন শিক্ষাপদ্ধতির এবং মহামতি লর্ড কার্জ্জনের ইউনিভারসিটী কমিশনের কথা এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাহিত্যালোচনার কালে ছাত্রগণের সমক্ষে মানব হৃদয়ের বৃত্তিগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অন্তর্ভূত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দিতেন; তাঁহাদিগকে ভাবুক ও রসজ্ঞ করিতে চেষ্টা করিতেন। সেই সুশিক্ষকগণ সৃষ্টি রহস্য দেখাইয়া স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল দেখাইতেন। তারকা শোভিত নীল নভোমণ্ডল, প্রশান্তনীল নীরধি, তুষার মণ্ডিত গগনস্পর্শী গিরিরাজের বর্ণনায় স্রষ্টার সৌম্য মূর্ত্তি অনুভব করিতে বলিতেন। কঠোর বজ্রের শ্রবণ ভৈরব নির্ঘোষে, খণ্ডপ্রলয় কারী প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে, তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে বলিলেন। সুকুমার শিশুর বিমল হাস্যে শিশির স্নাত ঈষদ্ভিন্ন কোরকে, ফুল্লফুলে, স্নিগ্ধ সলিলে, শীতল বায়ুহিল্লোলে, তাঁহার করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে শিক্ষা দিতেন। পাঠ্য পুস্তকের বর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্জগত ও বহির্জগতের দৃশ্যের সহিত কি প্রকারে মিলাইয়া পাঠ করিতে হয়, কিরূপে তাহার রসাস্বাদ করিতে হয় তাহা তৎকালের সুশিক্ষকগণ যত্নের সহিত বলিয়া দিতেন। শিক্ষকগণের সুন্দর অধ্যাপন প্রণালী ছাড়া তখনকার শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের সহিত সহৃদয় ব্যবহার করিতেন। ছাত্রগণের শুভ চেষ্টায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতেন। ছাত্রগণের সহিত শিক্ষকগণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অনেক দেবি প্রকৃত আদর্শ শিক্ষক আছেন। তাঁহারা না থাকিলে দেশের শিক্ষার অবস্থা যে কিরূপ হইত বলা যায় না। তবে, নানা কারণে এইরূপ সুশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না ইহাই পরিতাপের বিষয়। সে কালে শিক্ষকগণ কৃতী উদ্ভিদ্ বিদের ন্যায় জ্ঞানের বীজ ছাত্রগণের মানস ক্ষেত্রে রোপন করিতেন এবং যাহাতে সুশিক্ষার সাহায্যে সেই উপ্তবীজ উদ্ভিন্ন হয়, কালে তাহা ফলচ্ছায়া সমন্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হয় তাহার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিতেন। বর্ত্তমানকালের ছাত্রগণকে

অনেকে স্ফঠিকগৃহের টবে বর্দ্ধিত কলমের চারার সহিত তুলনা করেন। যথারীতি জল দিলে ইহারা শীঘ্র ফল প্রসূ হয় বটে কিন্তু জননী ধরিত্রীর সহিত সম্পর্ক না থাকায় জলসিঞ্চন বন্ধ হইলেই সেইগুলির প্রমাদ ঘটে। তখন আর ইহারা দীর্ঘকাল ফলদান করিতে পারে না। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ের রোগক্লিষ্ট ক্ষীণ দৃষ্টি বিকৃত মস্তিষ্ক অনেক পনর ষোল বৎসরের বি, এ, এম, এ, দেখিলেই স্বতঃই ঐ উপমাটী মনে পড়ে। প্রকৃতির সহিত স্বাধীনচিন্তা ও গবেষণার যোগ না থাকাতে ভূমির সহিত বৃক্ষমূলের সম্পর্ক না থাকার ন্যায় ইহাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে পারে না। মধুসূদনের কালের শিক্ষকগণ অবশ্য বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নীতি ও নিয়মের কাঁচি হাতে করিয়া সতত বসিয়া থাকিতেন না। আর সেই জন্য সেকালের ছাত্রগণের মন ও হৃদয়ের বৃত্তিরূপ শাখা পল্লব কোথাও কোথাও এবং কখন কখন উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত।

মধুসূদন কিরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে ও শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বলা হইল। এক্ষণে তিনি কি প্রকার মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন তাহার কথা বলা আবশ্যক। মধুসূদন অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। লেখা পড়ায় সর্ব্বত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবার ইচ্ছা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই প্রবল ছিল এবং সেই জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। হিন্দু কালেজে আসিয়া তিনি অল্প দিনের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রায়ই সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতেন। এই সময় হইতেই তিনি বিদ্যালয়ের শ্রেণী পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্যান্য অনেক পুস্তক পাঠ করেন। মধুসূদনের জীবন চরিত পাঠে জানা যায় যে তিনি যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন ইংরাজী সাহিত্যের এত গ্রন্থ পাঠ করিয়া

ছিলেন যে এখন একজন বি, এ, তত গুলি পুস্তক পাঠ করিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। মধুসূদন ভোগবিলাসে অসংযতচিত্ত হইলেও অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিবার তাঁহার অনন্য অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে তিনি পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইলে তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা, আহার নিদ্রা মনে থাকিত না। যে ভোগবিলাসের উৎকট বাসনার জন্য তাঁহার চরিত্রে নানা কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছিল, বাগ্‌দেবীর আরাধনা কালে তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপ দমন করিতে পারিতেন। ইহা দ্বারা তাঁহার বিদ্যালাভের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মধুসূদনের বুদ্ধি সর্ব্ববিষয় গ্রাহিণী ছিল। অনেকের ধারণা যে সাহিত্যসেবকগণ গণিতে স্থূলবুদ্ধি হয়েন। তাঁহাদের এ ধারণা মধুসূদনের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নহে। কারণ তিনি একবার ক্লাসে তর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে কাব্যমোদীজনও গণিতে পারদর্শী হইতে পারেন, এবং একদিন যখন ক্লাসের সকল বালক গণিতের একটী জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে অপারক হয়েন তখন তিনি সুন্দর প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার সমাধান করিয়া নিজের কথা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক সাহিত্যানুরাগ হেতু তিনি তাহার পর আর গণিতে মনোনিবেশ করেন নাই।

হিন্দুকালেজে শিক্ষাবস্থা হইতেই তিনি পঠন ও লিখন উভয়বিধ উপায় দ্বারা সাহিত্য চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ সভা সমিতি গঠন করিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। গৃহে অভিভাবক ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক উভয়ে এবিষয়ে উৎসাহ দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসন মধুসূদনের প্রকৃতি দত্ত সাহিত্যানুরাগ যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তেমনই উৎকৃষ্ট রচনা পদ্ধতি শিখাইয়া এবং তাঁহার রচিত

কবিতা সকল সংশোধিত করিয়া তৎকালীন "লিটারারী গ্লিনার" "ব্লসম্" "কমেট" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করাইয়া উৎসাহিত করিতেন। হিন্দুকালেজ অবস্থান কালে তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে শিক্ষানবিসীর সূচনা হয়। এই সময় হইতে তিনি সাহিত্যজগতে সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার বাসনা যত্নের সহিত হৃদয়েপোষণ করিতে লাগিলেন। সহপাঠীদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় বন্ধুগণের সহিত পত্রালাপে হৃদয়ের এই উচ্চাভিলাষের কথা উল্লেখ করিতেন। মধুসূদন যে জীবনের নানা অবস্থাবিপাকে পড়িয়াও সেই উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করেন নাই তাহা ক্রমে দেখান যাইতেছে। মধুসূদনের হিন্দুকালেজে শিক্ষাবস্থায় কলিকাতার ছাত্রসমাজের নৈতিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। যে সকল অনাচার ও কদাচারের নাম এখন লোকে ঘৃণার সহিত উল্লেখ করে তখনকার ছাত্রগণ আপনাদিগকে 'নব্যবঙ্গ' নামে অভিহিত করিয়া সেই সকল কুকার্য্য অহঙ্কার গৌরব ও স্পর্দ্ধার সহিত করিতেন। অবশ্য তৎকালের ছাত্রগণের অধিকাংশই উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী ছিলেন। সমাজ প্রচলিত কর্ম্মের বিপরীত কর্ম্মই সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাতঃরম্য মূর্ত্তি দেখিয়া ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ মুগ্ধ হইয়া যান। এবং তাঁহারা ইয়ুরোপীয়গণের ন্যায় বলবীর্য্যবান হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ আহার বিহার এমন কি তাহাদের ঘৃণা ও রুচির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। শুনা যায় তখনকার ছাত্রসমাজে নির্জলা ব্রাণ্ডি পান ও অর্দ্ধপক্ক গোমাংস ভক্ষণ "বাহবার" কার্য্য ছিল। ইউরোপীয় ফ্যাশনের প্রভাবও কম ছিল না। কথিত আছে স্বয়ং মধুসূদন একদিন এক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া কোন সাহেব পরামাণিকের দোকানে কেশ বিন্যাস করিয়া আসেন। এই প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া কত ধনীর সন্তান

লেখা পড়াত করিতই না অধিকন্তু ধনে প্রাণে মারা যাইত। মধুস্দনের প্রশংসার মধ্যে এই যে, এইরূপ প্রভাবের মধ্যে থাকিয়া এবং অন্যান্য গর্হিত কর্ম্ম করিয়া ও বাগ্‌দেবীর সাধনায় কখন বিরত হয়েন নাই। মধুসূদনের জীবনে এই সময় একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটে। হিন্দু কালেজে পাঠের শেষাবস্থায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেকালের 'নব্যবঙ্গের' মতি গতির অত্যধিক উৎকর্ষের উহা ফল মাত্র। মধুস্দনের এসকল কার্য্যের আলোচনা আমরা এখানে করিব না। মধুস্দন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মাইকেল মধুস্দনদত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গালীর চক্ষে শ্রীহীন হইলেন।

১৮৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মধুস্দন খ্রীষ্টান হয়েন। ইহার পর তিনি কিছুদিন শিবপুরের বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। হিন্দু কালেজে অবস্থানকালে কাপ্তেন রিচার্ডসন যেমন তাঁহাকে কাব্য-জগতের সৌন্দর্য্যাদি দেখাইয়া কবিতা রচনায় সুশিক্ষিত করেন বিশপস্ কালেজে আবস্থান কালে তথাকার বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপকগণ তাঁহাকে বিবিধ ভাষা শিক্ষার সহায়তা করেন। বিশপস্ কালেজে তিনি চারি বৎসর অবস্থান করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, লাটীন, ফরাসী, জার্ম্মানী এবং ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষিত ইংরাজের ন্যায় অনর্গল বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় তিনি এতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন যে ঐ দুই ভাষাতে অক্লেশে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মধুস্দন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পরও তাঁহার সুশিক্ষার জন্য তাঁহার স্নেহশীল পিতা তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতাও পিতার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রায়ই অর্থ সাহায্য করিতেন। এই প্রচুর

অর্থ যে কেবল তাঁহার সুশিক্ষার জন্য ব্যয় হইত তাহা নহে। বিশপস্ কালেজে অবস্থান কালে, তিনি তথাকার খৃষ্টান যুবকদের কুসংসর্গে পড়িয়া আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়েন। তাঁহার ঔদ্ধত্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাঁহার উদ্ধত ও অশিষ্ট চরিত্রের জন্য পিতার সহিত বিষম মনোমালিন্য ঘটে। ক্রমে তিনি পুত্রকে যে অর্থ সাহায্য করিতেছিলেন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। এত দিন স্বসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও কোন রূপে স্বদেশে ছিলেন। কিন্তু অতঃপর পিতার ত্যাজ্য পুত্র হইয়া অর্থাভাবে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। যে ধর্ম্ম লোককে রক্ষা করে, সেই ধর্ম্ম মধুসূদন ত্যাগ করেন। তিনি খৃষ্টান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তিনি খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। কারণ ধার্ম্মিক হইলে তিনি কখনই ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হইতেন না। ইহার ফলে এই হইয়াছিল যে তিনি কোথাও শান্তি পাইতেন না। স্বদেশে প্রবাসী হইয়া থাকা অপেক্ষা প্রকৃত প্রবাসই তিনি পছন্দ করিলেন। তিনি মান্দ্রাজে গিয়া সুখে ও শান্তিতে থাকিবেন এই আশায় মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। ১৮৪৮ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি মান্দ্রাজে বাস করেন। মান্দ্রাজে গিয়া তিনি অবস্থার উন্নতি করিবেন, শান্তি পাইবেন এবং সুখে থাকিবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদনের এসকল আশা সেখানে পূর্ণ হয় নাই। মান্দ্রাজে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত হিতৈষী বা বন্ধু বড় কেহ ছিলেন না। মান্দ্রাজ যাত্রার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অর্থকষ্ট হইয়াছিল। অধিক কি তাঁহাকে পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করিতে হয়। মান্দ্রাজে যখন উপস্থিত হইলেন তখন তিনি একরকম রিক্তহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একে এই দারুণ দারিদ্র্য তাহার উপর রোগ আসিয়া দেখা দিল। মান্দ্রাজে পৌছিবার অব্য-

বহিত পরেই তিনি কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েন। মধুসূদনের এই সময়কার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এখন কল্পনায় আনিলেও কষ্ট হয়। না জানি তিনি কি অসহ্য যন্ত্রণাই সহ্যকরিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্তপরিবারের সন্তান সংসারের সকল সুখ থাকিতেও তিনি নিজ কর্ম্মফলে সেই সুদূরপ্রবাসে অনাথ অসহায় অবস্থায় পড়িয়া প্রথমে কি কষ্টই না ভোগ করিলেন। আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সেই দুর্দ্দিনে সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন তিনিও সকলকে ত্যাগ করিয়াছিলেন কেবল একমাত্র বাগ্‌দেবীর উপাসনা তিনি ত্যাগ করেন নাই। দেবীও ভক্তকে ত্যাগ করেন নাই। মধুসূদন খৃষ্টীয়বিদ্যামন্দিরে প্রথমে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। মান্দ্রা-জের বিবিধ সংবাদপত্রাদিতে লিখিতে লাগিলেন। এতদিন যশের জন্য সাহিত্যসেবা করিতেছিলেন এখন জীবিকার জন্য সাহিত্যসেবা করিতে লাগিলেন। বরদা বাগ্‌দেবী ভক্তের সাধনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতঃপর যশ ও জীবিকা দুই দিতে লাগিলেন। যখন সাহিত্যসেবা দ্বারা ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল পাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসাও পাইতে লাগিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা যদি আমরা কল্পনার চক্ষে এখন দেখিতে পাইতাম তবে তাহা নিশ্চয়ই তাহা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দেখিতাম। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে মধুসূদন বাগ্‌-দেবীকে সম্বোধন করিয়া ঃ—

"বাসনার বসে মন অবিরত,
ধায় দশ দিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে।

সবাই ছেড়েছে নাহি যার কেহ
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ
নিরাশ্রয়জন, পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।”

বলিতেছেন এই দৃশ্যই কল্পনাযোগে মানসক্ষেত্রে উদিত হয়।

মধুসূদনের অদম্য ইচ্ছাশক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি মান্দ্রাজ-প্রবাসকালে দুর্ল্লঙ্ঘ্য দারিদ্র্যগিরি তাঁহার সেই ইচ্ছার সম্মুখবর্ত্তী হয়। মধুসূদন তাহা অতিক্রম করিতে প্রয়াস পান। এবং ইহার ফলে কাব্যজগতে “ক্যাপটীবলেডী” নামক একটী ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। ক্যাপটীব লেডীর বর্ণনীয় বিষয় সংযুক্তাহরণ। মধুসূদনের রচনা ইংরাজীতে হইলেও উহা তাঁহার হৃদয়ের ন্যায় দেশীয় উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। দেশের পুরাণ ইতিহাস হইতেই তিনি তাঁহার প্রথম কাব্যের নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষায় রচনা অনভ্যস্ত হইলেও তিনি দেশের পুরাণ ইতিহাসের সহিত সম্পূর্ণ-রূপে পরিচিত ছিলেন একথা ক্যাপটীবলেডী পাঠে বেশ বুঝা যায়। ক্যাপটীবলেডীর সমাদর ও আলোচনা ভালই হইয়াছিল। কিন্তু মধু-সূদনের জন্মভূমি বঙ্গদেশে ক্যাপটীবলেডীর তেমন আদর বা আলোচনা হয় নাই। তিনিকলিকাতার সংবাদপত্রে সমালোচনার জন্য ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহারের জন্য কয়েকখণ্ড পুস্তক পাঠান। যে সকল, বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহার পাঠান তাঁহাদের মধ্যে ভারতহিতৈষী মাহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব একজন। বেথুন সাহেব পুস্তক পাঠ করিয়া রচয়িতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাকে একটী অমূল্য উপদেশ দেন। বলিতে কি, কাব্যজগতে মধুসূদনের প্রবল-ইচ্ছাশক্তির গতি মহাত্মা বেথুনই নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বেথুন সাহেব

ক্যাপটীবলেডীতে কল্লোলিনীর শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেই কলনাদিনীকে বঙ্গভাষাভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইতে পারিলে বঙ্গভাষার সমূহ উপকার হইবে এই বিশ্বাসে তিনি মধুসূদনকে সেই সুন্দর উপদেশ দেন। মহাত্মা বেথুনের মহামূল্য উপদেশ ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের শুনা উচিত। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে "অবকাশরঞ্জনের জন্য অথবা ইংরাজী ভাষাতে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য মাঝে মাঝে ইংরাজী রচনা মন্দ নহে। কিন্তু যাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে তিনি মাতৃভাষায় রচনা করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার করিবেন এবং নিজেও যথেষ্ট যশ লাভ করিবেন। এমন কি মৌলিক রচনা না করিতে পারিলেও কেবল ভাল ভাল বিষয় বিশুদ্ধ-রূপে অনুবাদ করিয়া দেশের ও মাতৃভাষার প্রভূত উপকার করা যাইতে পারে।

* ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা বেথুন বঙ্গদেশীয় যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজের পারিতোষিক বিতরণ সভায় দেশীয় ভাষা চর্চ্চা সম্বন্ধে যেসারগর্ভ উপদেশ দেন তাহার অনুরূপ উপদেশ সম্প্রতি বোম্বাইয়ের সুযোগ্য গভর্ণর মহামতি লর্ড নর্থকোট সাহেব দেশীয় রাজকুমারগণকে দিয়াছেন। লর্ড নর্থকোটের বর্ত্তৃতার অংশ এই ঃ—I would impress upon you the great necessity of a through study of your own vernaculars. You have every reason for such study. I myself—though I can only read the works in an English partial translation—read with utmost pleasure such works as the Mahabharata and Ramayana, and you here in this country of the East, in a land teeming with legend and tradition must possess treasures of vernacular stores of learning of which most of us Europeans have not even heard the title. In the second place it is an almost necessary attribute of a gentleman that he should have a thorough knowledge of his own tongue and of the principal works composed therein. What would be thought in England of an average English gentleman who did not know his Shakespeare and other

মধুস্থদন শুভক্ষণে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মধুস্থদন বঙ্গসাহিত্যসেবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ আনাইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মধুস্থদন বিবিধ ভাষার বহুবিধ কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন। মধুস্থদন আজন্মকবি। কবিজনোচিত প্রবণতা চিরকালই তাঁহার হৃদয়ে ছিল। তাহার উপর বহু ভাষার সাহিত্য আলোচনা করিয়া তিনি ভাবসম্পদে সৌভাগ্যবান ছিলেন। বঙ্গভাষার শব্দসম্পদ সংগ্রহের জন্য তিনি মহাভারত রামায়ণের আশ্রয় লইলেন। এবং সংস্কৃতও চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজপ্রবাসকালে তিনি কিরূপ অধ্যয়নপর ছিলেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অধ্যয়ন শীল ছাত্রকে ও তিনি পরাস্ত করিয়া ছিলেন। উদরান্ন সংগ্রহের জন্য তিনি চারি ঘণ্টা বিস্থালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। বাকী অধিকাংশ সময়ই ভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত করিতেন। প্রাতে দুই ঘণ্টা হিব্রু, মধ্যাহ্নে দুই ঘণ্টা গ্রীক অপরাহ্নে তিন ঘণ্টা তেলেগু ও সংস্কৃত সায়াহ্নে দুই ঘণ্টা লাটীন এবং রাত্রিতে তিন ঘণ্টা ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। এইরূপ সাধনার মধ্যে তাঁহার মাদ্রাজ প্রবাস কাল শেষ হয়।

ordinary English classics? You, who will occupy relatively far more prominent position in your own country than the ordinary English gentleman holds, should know its language and literature thoroughly. Lastly, I would remind you if you wish to learn English or any other language really well, a thorough knowledge of your own tongue is, to say the least, an immense advantage. You may pick up otherwise the same sort of colloquial knowledge of English that any of us do, of Guzrati or Marathi, but you cannot learn a foreign tongue thoroughly and scientifically until you are absolute master of your own" : মহামতি লর্ড নর্থকোটের উপদেশে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের ভাবিবার ও শিখিবার অনেক কথা আছে।

১৮৫৬ সালের প্রথমে মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। স্বদেশে ফিরিলেন বটে, কিন্তু সেখানে স্বজন এমন কেহ ছিলেন না যে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া গ্রহণ করেন। মান্দ্রাজে অবস্থান কালে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার খিদিরপুরের বাটী তখন অন্যের অধিকৃত। তিনি "নিজবাস ভূমে পরবাসী" হইলেন। যাহাহউক তিনি কলিকাতায় পুনরায় বাসস্থান করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি কলিকাতার পুলিস আদালতে কেরাণীর কর্ম্ম পাইলেন। ঐ কর্ম্ম তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই। শীঘ্রই তিনি দ্বিভাষীর পদে উন্নীত হন। মধুসূদন এখন কলিকাতায় অনেকটা নিশ্চিন্ত ও স্থায়ী ভাবে থাকিতে পারিবেন তাহার সম্ভবনা হইল। এদিকে তাঁহার চিরজীবনের সখা গৌরদাস বাবুর সাহায্যে তিনি কলিকাতার সৌখীন ও শিক্ষিত সমাজে মিশিবার সুযোগ পাইলেন। সেখানে গৌরদাস বাবুর দ্বারা পরিচয় মাত্রের আবশ্যক ছিল। মধুসূদন অসংযত চরিত্র হইলেও তাঁহার অন্যান্য অনেক গুণ ছিল। তিনি বিদ্বান, মিষ্টভাষী, সদালাপী ও রসিক পুরুষ ছিলেন। ক্ষণিকের আলাপে লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে সকলের নিকট তিনি পরিচিত হইলেন এবং শিক্ষিত ও সৌখীন সমাজে মধুসূদনের বিদ্যামত্তা প্রভৃতির কথা প্রচারিত হইল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ বেলগাছিয়ার থিয়েটারের উদ্যোগ হয়। বাঙ্গালী নাটক অভিনয় করিবেন, নাট্যশালা নির্ম্মাণ হইল। কিন্তু বাঙ্গালায় নাটক কই? কাজেই পুরাতন রত্নাবলীর বাঙ্গালা অনুবাদ হইল। বেলগাছিয়ার থিয়েটারের উদ্যোগ ও আয়োজন অতি সুন্দররূপে করা হয়; এবং সেখানে অভিনয় দেখিবার জন্য অনেক য়ুরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহাদের জন্য রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদের আবশ্যক হয়। এই অনুবাদ কার্য্য মধুসূদন করেন।

রত্নাবলীর অনুবাদ পাঠ করিয়া কি দেশীয় আর য়ুরোপীয় ভদ্রলোক সকলেই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয় যোগ্য নাটক তখন প্রায় ছিলনা বলিলেও হয়। এই অভাব মধুসূদন বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিলেন। এই অভাব মোচনের জন্য তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টার প্রথম ফল শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। শর্ম্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ তখনকার নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। মধুসূদন যখন এই নাটক রচনা করেন তখন তিনি পুরা সাহেব। ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, আহার বিহারে, তিনি সম্পূর্ণ রূপে বিজাতীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে যে এতটা জাতীয়তা ছিল একথা তাঁহার বয়স্যেরা কেহ জানিতে পারেন নাই। তাহার উপর, প্রথম চেষ্টায় তিনি যে অমন সুন্দর বাঙ্গালা রচনা করিতে পারিবেন একথাও কেহ প্রথমে ভাবেন নাই। সুতরাং শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া যে সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন তাহার আর বিচিত্র কি? নব্য সম্প্রদায় ত তাঁহার পাণ্ডুলিপি পাঠে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিত সম্প্রদায়ের চক্ষে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের বহু দোষ ছিল। এবং উহা নাটকই হয় নাই বলিয়া তাঁহারা ঘৃণা প্রকাশ করেন। মধুসূদন পণ্ডিত সমাজের মত গ্রাহ্যও করিলেন না। তিনি নিজের ক্ষমতায় আস্থাবান ছিলেম। নিজের বিচার শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রতিকূল সমালোচনাকে উপেক্ষা করিয়া সাহসের সহিত শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনয় উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিলেন। মধুসূদনের সাধনায় ও সাহসে দেবী সরস্বতী সুপ্রসন্ন হইলেন এবং উপদেশ স্থলে বঙ্গ কুললক্ষ্মী নিশার স্বপনে যেন সত্য সত্যই বলিলেন

—হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব ,তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?

অতঃপর দেবী সরস্বতীর বরে মধুসূদন বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে সিদ্ধপুরুষ।

জগতে সকলে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসে নাই। কর্ম্ম আমাদের সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য হইলেও তাহার প্রকার ভেদ আছে। সমাজের বিভাগ ভেদে কর্ম্মভেদের ব্যবস্থা আছে। লোকে আপন আপন ক্ষমতা ও রুচির প্রবণতা অনুসারে কার্য্য করিবে। আমরা রামদুলাল সরকারের জীবনে এই বিষয়ের একটী উজ্জ্বল আদর্শ দেখিতে পাই। রামদুলাল প্রকৃত পক্ষেই ভিক্ষালব্ধ অন্নে শৈশবে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। অর্থের অভাব কত তীব্র, অন্নের চিন্তা কত ভয়ঙ্কর তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার প্রতিপালক মদনমোহন দত্তের সৌভাগ্য ও সৌজন্যও দেখিয়াছিলেন। ক্রমে মদনমোহনের অনুগ্রহে তিনি বিল ও সিপসরকারের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া কলিকাতার তদানীন্তন বাণিজ্যের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই কথার সারবত্তা তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। লেখা পড়ায় পণ্ডিত হইতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। —বাণিজ্য করিব, প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিব—ক্রিয়া কলাপে জীবনকে ধন্য করিব—এই আশাই তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি বাণিজ্যের গূঢ় রহস্য শিখিয়াছিলেন। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ সেইখানেই শিখিয়াছিলেন এবং তাহাকেই জীবনের মূল মন্ত্র করিয়াছিলেন। ভবিষ্যত জীবনে সেই মন্ত্রের সাধনা করিয়া

সেই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া তিনি সেই মহাবাক্যের যথার্থ্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

মূলধন অল্প হইলেও তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু তাহা যদি বিবেচনা করিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করা যায় তবে তাহাতেও যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়, ইহা রাম দুলালের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনশন বা অর্দ্ধাশন জনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়া পাঁচ টাকা বেতন হইতে অল্পে অল্পে একশত টাকা সঞ্চয় করেন। এবং উহা দ্বারা কঠের ব্যবসায় করেন। ঘটনাটী সামান্য। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহাই রামদুলাল সরকারের জীবনের মূলমন্ত্র "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" সাধনার প্রথম অনুষ্ঠান।

রামদুলাল সরকার বাল্যকাল হইতে অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন। বিল সরকারী এবং সিপসরকারী কার্য্য গ্রহণ আর তাহা দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত সম্পাদন করাই তাঁহার শ্রমশীলতার যথেষ্ট প্রমাণ। সুরম্য হর্ম্মের কক্ষাভ্যন্তরে লম্বমান বায়ু সঞ্চালনী সমন্বিত বীরণমূলের মৃদুগন্ধামোদিত কার্য্যালয়ে সামান্য বেতনের মসীজীবিগণ প্রায়ই আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অতিরিক্ত শ্রমসাপেক্ষ ও কষ্টদায়ক বলিয়া ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া প্রভুর কার্য্যে প্রবঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, এবং এক গোলামী ত্যাগ করিয়া অপরত্র গোলামীর চেষ্টা করেন। দশ পাঁচ টাকা বেতনের বিল সরকারী বা সিপসরকারী কার্য্য বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত করিতে হইলে কি পরিমাণ পরিশ্রম ও লোভ সংবরণ আবশ্যক ইঁহারা তাহা সহজে ধারণা করিতে পারেন না। যদি তাঁহারা তাহার ধারণা করিতে পারিতেন তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইত এবং দুর্দ্দশা মোচনের সম্ভাবনা থাকিত। একবার একজন

লোক কোনও অবসর প্রাপ্ত যশস্বী সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত সৈনিক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়, কি করিলে আপনার ন্যায় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারা যায়? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, ইহা অতি সামান্য কথা। যাহা করিলে আমার এই ঐশ্বর্য্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা এখনই বলিতেছি। আপনি বসুন। আপনাকে একটী সর্ত্ত করিতে হইবে। সেই সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিলেই আপনি আমার এই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইবেন। লোকটী বিস্মিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। সৈনিক পুরুষ বলিতে লাগিলেন সর্ত্তটী এই :— আপনি ও আমি দশ বার হাত ব্যবধানের মধ্যে থাকিব। এবং আমি আপনাকে পনর বার তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাত করিতে চেষ্টা করিব ততোধিক বার বন্দুক দ্বারা আহত করিতে চেষ্টা করিব। আমার এই সকল আক্রমণ হইতে যদি আত্মরক্ষা করিতে পারেন তবে আমার এই সমস্ত বিষয় বিভব আপনার। লোকটী এই ভীষণ সর্ত্তের কথা শুনিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং কম্পিত অধরে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, না মহাশয়, ঐশ্বর্য্যের আবশ্যক নাই। তখন ঐ সৈনিক পুরুষ আবার বলিতে লাগিলেন দেখুন, আমি অনেক রণক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আদেশের অধীন হইয়া উহা অপেক্ষা অধিকতর বিপদ সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে কার্য্য করিয়াছি। হস্তে বক্ষে কত ক্ষত চিহ্ন দেখুন কত বার যে মৃত্যু মুখ হইতে ফিরিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। জীবন মরণের মধ্যে সাধনা করিয়া ছিলাম। সে সাধনায় এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।

যদি সাদৃশ্য থাকিলে ক্ষুদ্র বৃহতের মধ্যে তুলনা সঙ্গত হয়, তবে বীর সৈনিক পুরুষের ভাগ্য লাভের কাহিনী বাঙ্গালী রামদুলালের ভাগ্য লাভের কাহিনীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সৈনিক পুরুষের ন্যায় তিনিও ভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপাকাঙ্ক্ষী যুবককে বলিতে পারিতেন,

বাপু হে, যদি বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে, নিত্য আট দশ ক্রোশ পথ পদব্রজে গতায়ত করিতে পার, যদি শ্রাবণের মুষলধারার মধ্যে দস্যু ভয় পূর্ণ মাঠে শৃগাল কুক্কুরের ভয়াবহ চীৎকার মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রিতে বৃক্ষতলে প্রভুর প্রচুর অর্থ একাকী রক্ষা করিতে সমর্থ হও, যদি গঙ্গার অতল জলে পতিত হইয়াও প্রভুর স্বার্থ ও নিজের জীবন রক্ষা করিতে পার, যদি বিপুল অর্থ পাইয়া, কলঙ্কের ভয় না থাকিলেও, তাহার স্বত্ব অম্লান বদনে ত্যাগ করিতে পার, তবে আমার এই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবার জন্য তোমাকে যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচনা করিব। জিজ্ঞাসাকরি, কয়জন যুবা এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন? অনেকেই :এই প্রস্তাব শুনিয়া ইতস্ততঃ করিবে এবং কেশ কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বলিবে, প্রাণটা আগে, অর্থ পরে, প্রাণ থাকিলে ভিক্ষা করিয়া খাইব। যাহারা এই রূপ কাপুরুষ শ্রমবিমুখ তাহারা কবে কোথায় কি করিয়াছে? যাহারা বাল্যে কৈশোরে শিক্ষায় অমনোযোগী যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্যে উপেক্ষাশীল তাহাদের বার্দ্ধক্য যে বিড়ম্বনা পূর্ণ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

রামদুলাল সরকারের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইতে হইলে রামদুলাল সরকারের ন্যায় সাধনা করিতে হইবে। তিনি বাল্যে পরান্নে প্রতিপালিত হইয়া অতিকষ্টে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদূর বিদ্যাভ্যাস করিয়া হস্তাক্ষর মুক্তামালার ন্যায় সুন্দর করিয়াছিলেন। যখন যে অবস্থায় থাকিবে সেই অবস্থাতেই প্রাণ পণ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে কার্য্য করিবে এই নীতি-বাক্য স্মরণ করিয়া যেন তিনি কার্য্য করিতেন। পাঁচ টাকার বিলসরকারের কার্য্যও তিনি সাধুতা ও নিষ্ঠার সহিত করিতেন। দমদমা, ও বারাক-পুরের সৈন্যাবাসের সাহেবদের সহিত তাঁহার প্রভুর কারবার ছিল।

ইঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য কলিকাতা হইতে পদব্রজে প্রায়ই সে সকল স্থানে নিত্য যাতায়ত করিতে হইত। কি বৈশাখের রৌদ্র, কি শ্রাবণের ধারা, আর কি পৌষের শীত কিছুই তাঁহার কর্ত্তব্য সাধনের অন্তরায় হইত না। তখন কলিকাতা হইতে বারাকপুরের পথ বড় বিপদসঙ্কুল ছিল। শুনাযায় একবার রামদুলাল বিলের টাকা লইয়া আসিতেছেন এমন সময় দমদমার নিকট পথে রাত্রি হয়। তিনি পাছে প্রভুর টাকা দস্যু তস্করের দ্বারা অপহৃত হয়, এই ভয়ে, পথের ধারে কোনও লোকের বাটীতে আশ্রয় না লইয়া গাছ তলায় দরিদ্র পথিকের বেশে টাকাগুলি লইয়া রাত্রি যাপন করেন। ইহা কি কম কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয়? ইহার পর রামদুলাল যখন দশ টাকা বেতনের সিপসরকার তখন জাহাজে প্রভুর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গিয়া দুই বার জলমগ্ন হয়েন। তিনি দুই বারই সন্তরণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এই সকল ঘটনা হইতে দেখাযায় যে কর্ত্তব্য পরায়ণতা চিরকালই তাঁহার চরিত্রের প্রবল গুণ ছিল। এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ যিনি, তিনি যে সত্যপরায়ণ ও নির্লোভি হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। রামদুলালের সত্যনিষ্ঠা ও লোভসম্বরণই সাক্ষাত ভাবে, তাঁহার সৌভাগ্য আনয়ন করে। যে ঘটনায় তাঁহার ভাগ্যদেবতা তাঁহার উপর প্রসন্ন হয়েন, সেটী এই। রামদুলাল বিদ্বান ছিলেন না। পুস্তকাদি পাঠে অন্যের অভিজ্ঞতা জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ন্যায় স্বোপার্জ্জিত। কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর শিক্ষাগারে, লোকচরিত্র ও ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি যখন সিপসরকারের কাজ করেন, তখন অর্ণব বাণিজ্য বিষয়ের অনেক তথ্য শিখিয়া ছিলেন। জাহাজে করিয়া কিরূপ মাল আমদানি রপ্তানি হয় কিরূপ জাহাজে কি প্রকার দ্রব্য থাকিতে পারে, কোন কোম্পানার জাহাজে কি কি দ্রব্যাদির ব্যবসায় হয় ইত্যাকার

বহুবিধ সংবাদ তিনি জানিতেন। এই প্রকার জাহাজের বিশেষ জ্ঞান থাকাতে তিনি জলমগ্ন জাহাজের আনুমানিক মূল্যাদি নিরূপণে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। রামদুলালের এই বিষয়ের পারদর্শিতাই ভবিষ্যতে তাঁহার বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি সে সময়ে টালায় এইরূপ জলমগ্ন জাহাজ সকল নীলাম হইত। টালা নীলামের জন্য প্রসিদ্ধ। একবার মদনমোহন দত্ত রামদুলালের হাতে ১৪০০৲ টাকা দিয়া টালায় কোন নীলাম খরিদের জন্য পাঠান। কিন্তু রামদুলাল বিজ্ঞাপিত সময়ে সেখানে পহুছিবার আগেই সেটীর নীলাম শেষ হইয়া যায়। রামদুলাল অবশ্য ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক তিনি সেই দিন সেই থানে উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই আর একখানি জলমগ্ন জাহাজ নীলামে উঠে। জাহাজ খানির কথা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। নীলাম স্থলে জাহাজের মূল্য হিসাবে ডাক অত্যন্ত কম হইতেছে তাহা তিনি বুঝিলেন। এবং শেষে নিজের দায়িত্বে, প্রভুর বিনা অনুমতিতে, তিনি ১৪০০৲ টাকায় ঐ জাহাজ নীলাম ডাকিয়া লইলেন। রামদুলালের ডাক গ্রহণের অল্পক্ষণ পরে একজন বিশিষ্ট এবং সম্পন্ন সাহেব বণিক সেখানে উপস্থিত হইলেন। বণিক দেখিলেন তিনি বিলম্বে আসিয়াছেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই জাহাজ নীলাম হইয়া গিয়াছে। এবং একজন বাঙ্গালী সরকার ঐ জাহাজ নীলাম ডাকিয়া লইয়াছে। সাহেব খুঁজিয়া রামদুলালকে বাহির করিলেন। তাঁহাকে নানাভাবে নানা কথা বলিলেন। শেষে রামদুলাল একলক্ষ টাকা লাভে জাহাজ সাহেবকে বিক্রয় করিয়া দিলেন। এত যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, রামদুলালের প্রভু মদনমোহন দত্ত তাহার কিছুই জানিতেন না। সাহেব যখন সমস্ত মূল্য দিলেন তখন রামদুলাল ঐ টাকা লইয়া প্রভুর হস্তে দিয়া আমূল বৃত্তান্ত বলিলেন। মদনমোহন উপযুক্ত

ভৃত্যের উপযুক্ত প্রভু ছিলেন। তিনি লভ্যাংশ গ্রহণ করিলেন না। তিনি ঐ টাকা রামদুলালকে দিলেন। রামদুলাল ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ঐ টাকা প্রভুর অজ্ঞাতসারে লইয়া প্রভুর টাকা প্রভুকে দিতে পারিতেন। কিন্তু রামদুলালের প্রবৃত্তি অন্যরূপ ছিল। এইরূপ অবস্থায় লোভ সম্বরণ করিতে যে কতটা মনের বল আবশ্যক তাহা বুঝা চাই। এই অসাধারণ চরিত্র বলের জন্য মদনমোহন দত্ত তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। প্রভুর প্রদত্ত ঐ পুরস্কারের টাকা তাঁহার সৌভাগ্য সৌধের প্রথম সোপান হইল। যে বালক অনশন ও অর্দ্ধাশনের ক্লেশ সহ্য করিয়া শত মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মন্ত্র সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, আজ যৌবনে ভগবৎ প্রসাদে তিনি লক্ষ মুদ্রায় বিস্তৃতরূপে বাণিজ্যের প্রসার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। ইহার পর তাঁহার বাণিজ্য বহুদেশে বিস্তৃত হয়। বন্দরে বন্দরে তাঁহার জাহাজ যাইত। এ সুসময়েও তিনি একদিনের জন্য শ্রমবিমুখ ছিলেন না। দেবদ্বিজে তাঁহার ভক্তি কমে নাই। সত্য ও কর্ত্তব্যের পথ তিনি ত্যাগ করেন নাই। এবম্প্রকার অসাধারণভাবে সাধনা করিয়া রামদুলাল ভাগ্যদেবতাকে প্রসন্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। সাধনা বিনা সিদ্ধি কোথায়?

আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে অল্প বিস্তর মূলধন লইয়া পণ্য সংগ্রহ করিয়া দোকান সাজাইয়া বসিলেই ব্যবসা করা হয়। আর বাণিজ্য ব্যবসা করিলেই লাভ হয়। এই রূপ বিশ্বাস লইয়া এবং কেবল পাটীগণিতের সাহায্যে লাভের অঙ্ক গণনা করিয়া বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক ভদ্র সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এবং তাঁহারাই শেষে বলেন যে ব্যবসা করা "ভদ্রলোকের" কাজ নহে। "মুদী বেণেরই" ওসকল পোষায় বলিয়া তাঁহারাই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই সকল ক্ষতিগ্রস্ত লোকের আমূল কার্য্য প্রণালী পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের ঐ ঘৃণাসূচক মন্তব্যের কোনও মূল্য নাই। কারণ "ভদ্রলোক" হওয়ার জন্য তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন না। অধিকন্তু ব্যবসায়িক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবেই তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান যেমন শিক্ষা সাপেক্ষ, বাণিজ্য ব্যবসায় যে তদ্রূপ শিক্ষাসাপেক্ষ এ কথাটা বিচারস্থলে অনেকেই ভুলিয়া যান। ইহার প্রধান কারণ যে আমাদের দেশে সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞান শিখিবার যেমন বিদ্যালয় আছে বাণিজ্য শিখিবার তেমন ব্যবস্থা নাই। বাণিজ্য যে আবার শিখিতে হয় এটা অনেকের ধারণার মধ্যেই আসে না। বাণিজ্য শিখিবার কোন শিক্ষাগার নাই বলিয়া যে লোকে বাণিজ্য শিখে না তাহা নহে। বেতন দিয়া ছাত্র হইয়া বাণিজ্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের প্রথা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার। বিপনি বাণিজ্য শিক্ষার শিক্ষাগার। পণ্যবীথিকাই পণ্য পরিচয়ের উৎকৃষ্ট স্থান। ধনী বণিক সন্তানগণ সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াই আপন আপন পৈতৃক দোকানে বসিয়া বাণিজ্য শিক্ষা করিয়া থাকেন। দরিদ্রসন্তানের মধ্যে অনেকে উদরান্নের জন্য এই সকল দোকানে সামান্য বেতনে চাকরী গ্রহণ করিয়া উদরান্নসংগ্রহ ও বাণিজ্য শিক্ষা উভয়ই করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিদ্যালয়ের ন্যায় বাণিজ্য-শিক্ষাগার সর্ব্বত্র নাই বলিয়া যে বাণিজ্যশিক্ষার আবশ্যক নাই এরূপ বিবেচনা করা ভুল। ইয়ুরোপের শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যালয় থাকিলেও শিক্ষানবীশ সংক্রান্ত আইন আছে। ঐ আইন অনুসারে, অনেক দোকানদার বালকগণকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ঐ সকল শিক্ষানবীশেরা আবশ্যক মত দোকানের সর্ব্ব প্রকার কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে। একাজ করিব না ও কাজ

করিব বলিয়া তাহারা অভিমান করিয়া সেখানে বসিয়া থাকিতে পায় না। কর্ম্মদক্ষ হইলে কিছু কাল অল্প বেতনে সেখানে চাকরি করিয়া তাহারা নিষ্কৃতি পায়। দরিদ্র সন্তানের পক্ষে এরূপ আইন হিতকর।

আমাদের দেশে শিক্ষানবীশ সংক্রান্ত আইন উকীলের পুস্তকালয়ে দেখা যায়। কিন্তু উহা কার্য্যতঃ তেমন চলিত নাই। যাহা হউক, ঐ আইন চলিত না থাকিলেও শিক্ষানবীশী প্রথা চলিত আছে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেরা বৃথা অভিমানের জন্য আপন আপন সন্তানকে দোকানে শিক্ষানবীশী করিতে দেন না। যে সকল যুবকের ব্যবসায়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং উহাতে প্রবণতা আছে তাহাদের বাণিজ্যব্যাপারে শিক্ষানবীশী করিতে দেওয়া উচিত। তাহাতে সুফলই হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ পার্শী বণিক স্যর জেমসেটজী জি জি ভাইয়ের জীবন ইহার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জেমসেটজী জি জি ভাই শৈশবে পিতৃ মাতৃ হীন হয়েন। তাঁহার পিতামাতার জীবদ্দশাতে ফ্রেমজী নসরান্‌জী নামক জনৈক বণিকের দুহিতার সহিত জেমসেটজীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের অভাবে তিনি শ্বশুরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। শ্বশুরের আশ্রয়ে তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার তেমন সুযোগ ঘটে নাই। তিনি গুজরাটী ভাষা লিখিতে পড়িতে পারিতেন এবং অল্প স্বল্প ইংরাজী বুঝিতে পারিতেন। লেখা পড়া শিখিতে যে সময় ও সাধনার আবশ্যক হইত, সেই সময় ও সাধনার সাহায্যে জেমসেটজী শশুরের দোকানে শিক্ষানবীশ হইয়া বাণিজ্য ব্যাপার শিক্ষা করিয়া ছিলেন। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য ও রহস্য শ্বশুরের আশ্রয়েই শিক্ষা করিয়া ছিলেন। কিন্তু জেমসেটজী শ্বশুরের আশ্রয়ে বেশী দিন রহিলেন না।

১৭৯৯ খৃঃ অঃ ১৬ বৎসর বয়সে জেমসেটজী একজন পার্সী বণিকের অধীনে কেরাণীর কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চীন দেশে গমন করেন। জেমসেটজী যাইবার সময় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ১২০৲ টাকা সঙ্গে লইয়া যান। শ্বশুরের সাহায্যে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত এবং তাঁহার প্রদত্ত সামান্য বৃত্তি হইতে ঐ টাকা তিনি সঞ্চয় করেন। ইহা দ্বারা তাঁহার জীবনের সেই সময়ের আর্থিক অবস্থা বেশ বুঝা যায়। ইঁহার জীবনী আলোচনা কবিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি কথনও শিক্ষার সুযোগ অবহেলা করিতেন না। চীন দেশে অবস্থান কালে তিনি প্রভুর কর্ম্ম পরিশ্রম ও যত্নের সহিত করিয়া যে অবসর পাইতেন তাহাতে সেখানকার বাণিজ্যের অবস্থা মনোযোগের সহিত দেখিতেন। ভারতবর্ষজাত কোন পণ্যের প্রয়োজন চীনে অধিক এবং তাহা কিরূপ লাভে সেখানে বিক্রয় হইতে পারে তাহর সন্ধান লইতে লাগিলেন। বাজারে পণ্য দ্রব্য সকলের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি কি অবস্থায়, কি অনুপাতে হয় তাহা বিশেষ মনোযোগ দিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপ্রদেশের লোক চরিত্রও সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে লাগিলেন। কৃতী বণিক হইতে হইলে পণ্যের দোষগুণ যেমন জানা আবশ্যক, বাজারের অবস্থা, ক্রেতাগণের চরিত্র জানাও তদ্রূপ আবশ্যক। জেমসেটজী বোম্বাইয়ের শ্বশুরের দোকানে এসকল বিষয়ে যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। চীনে বাণিজ্যের সুবিধা দেখিয়া তিনি সেখানে বাণিজ্য করিবার জন্য উৎসুক হইলেন; মনে মনে সঙ্কল্প দৃঢ় করিতে লাগিলেন। এবং ইহার জন্য তিনি সাধনা করিতে লাগিলেন। অত অল্প বয়সে তিনি অভিভাবক হীন হইয়া বিদেশে ছিলেন, নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিতে ছিলেন, বিদেশে সমাজ বা বন্ধুগণের চক্ষের অন্তরালে কত কি করিতে পারিতেন, বিলাস

লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন চরিত্রে জলাঞ্জলি দিয়া ইন্দ্রিয় সুখ উপ-ভোগ করিতে পারিতেন। বিদেশে হাতে পয়সা হইলে অনেক যুবকই ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু জেমসেটজী এক দিনের জন্য কুপথগামী হয়েন নাই। তিনি জানিতেন চরিত্র ও স্বাস্থ্যই দরিদ্রের প্রধান সম্বল। এবং তিনি তাহা যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া ছিলেন। প্রভুর কার্য্য শ্রম ও যত্নের সহিত করার জন্য এবং তাঁহার চরিত্র ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অভিজ্ঞ-তার জন্য তিনি অল্প দিনের মধ্যে প্রভুর প্রিয় ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহাদের সমস্ত পণ্য বিক্রয় হইয়া গেল। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিলেন। জেমসেটজীর প্রভুর নিকট তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকে জেমসেটজীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বাণিজ্যে অভিজ্ঞতা ও সচ্চরিত্রতার কথা শুনিলেন। এদিকে স্বদেশে আসিয়াই জেমসেটজী চীনে নিজে বাণিজ্য করিবার আশায় মূলধনের সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য দু দশ টাকা, বা দু চারি হাজার টাকাতে হয় না। পণ্য ক্রয় করিয়া জাহাজ ভাড়া করিয়া বিদেশে যাইতে হইলে বহু অর্থের আবশ্যক। কিন্তু তিনি নিতান্ত গরিব। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রথম বার চীন যাত্রার সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থার কথা অনেকেই জানিতেন। চীন দেশে কেরাণীর কর্ম্ম করিতে গিয়া, বাণিজ্য ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়া ছিলেন সত্য, কিন্তু বেতন হইতে সঞ্চিত কিয়দংশ ভিন্ন অন্য ধন রত্ন আনিতে পারেন নাই তাহাও তাঁহার পরিচিত আত্মীয় বন্ধুগণ জানিতেন।

এমন অবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্যরূপ বৃহদ্ব্যাপারের জন্য চেষ্টা করাও অনেকে তাঁহার পক্ষে উন্মাদগ্রস্ত বা ধৃষ্টের কার্য্য বিবেচনা করিতে পারেন। কন্থায় শয়ন করিয়া লক্ষ মুদ্রার স্বপ্ন বলিয়া অনেকে উহা উপেক্ষা

করিতে পারেন। কিন্তু জেমসেটজী ঐ সকল ভাবিলেন না। তিনি একাগ্রচিত্তে মূলধন সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভগবানের কৃপায় ও তাঁহার গুণে জেমসেটজীর চেষ্টা সফল হইল। তিনি ৩৫০০০ পয়ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ পাইলেন। জেমসেটজীর চেষ্টা ত প্রশংসা যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উত্তমর্ণ এরূপ নিঃস্ব অথচ সদিচ্ছাপন্ন কুশলী ও কর্ম্মঠ যুবকের চরিত্রের আদর ও মর্য্যাদা করিয়া এত অর্থ ঋণ দেন তিনিও কম প্রশংসার পাত্র নহেন। যে দেশে ও যে সম্প্রদায়ের এরূপ গুণগ্রাহী লোক থাকেন সে দেশ ও সম্প্রদায় ধন্য! যে উত্তমর্ণ জেমসেটজীর চরিত্র, অভিজ্ঞতা, শ্রমশীলতার ভরসায় অত টাকা ঋণ দিতে সাহসী হইয়া ছিলেন তিনি কুসীদগ্রাহী মহাজন হইলেও তিনি মহাজন ছিলেন। জেমসেটজী যথা সময়ে এই ঋণ সুদসহ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া ছিলেন।

জেমসেটজী সর্ব্বসমেত পাঁচ বার চীন যাত্রা করেন। চতুর্থ যাত্রায় স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হয়েন। সেই সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে ছিল। জেমসেটজী যে জাহাজে ফিরিতে ছিলেন সেখানি যখন সিংহলের সন্নিকট হয় তখন তাহা ফরাসীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। জেমসেটজীর বহু অর্থ ও পণ্য তাহাতে ছিল। জেমসেটজী ও অন্যান্য আরোহীগণ ফরাসীদের নৌসেনাধ্যক্ষকে বিশেষ কাতর ভাবে তীরে অবতরণ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সে কাতর প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। জেমসেটজী সেই জাহাজে বন্দী হইয়া ফরাসীদের সহিত উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যান। পথে সকল কষ্টই সহ্য করিতে হইয়াছিল। বন্দীর আবার সুখ কোথায়? যাহা হউক সেখানে গিয়া ও একেবারে নিরাপদ ছিলেন না। ফরাসী কাপ্তেনের সন্দেহ হয় যে ইংরাজ পার্সী

ও মুসলমান যাত্রীগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সন্দেহের উপর তিনি উহাঁদিগকে গ্রেপ্তার করেন এবং অশেষ লাঞ্ছনা করেন ও কষ্ট দেন। এই সময়ে তাঁহাদের কষ্টের সীমা ছিলনা।

সমস্ত দিন রাত্রে জেমসেটজী একপোয়া চাউল একখানি বিস্কুট আহারের জন্য পাইতেন। যাহা হউক তিনি অনেক কষ্টে কেবল পরিধেয় বস্ত্র মাত্র লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। শারীরিক মানসিক কষ্ট ছাড়াও সেবার জেমসেটজীর ঐ যাত্রায় যথেষ্ট অর্থনাশ হয়। কিন্তু এজন্য তিনি ভগ্নোৎসাহ হয়েন নাই। তাঁহার জীবনচরিতে পাঠ করা যায় যে ইহার পরও তিনি একবার চীনযাত্রা করেন এবং শেষে ১৮০৭খৃঃঅঃ তিনি বোম্বাই নগরে আসিয়া স্থায়ীভাবে কারবার করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে জেমসেটজীর খ্যাতি প্রতিপত্তি চারি দিকে প্রচারিত হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে একাকী সমস্ত কারবার চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া, তাঁহার কারবার বড় বড় ইংরেজ কোম্পানির সমতুল্য করিবার মানসে যৌথ কারবার করিতে লাগিলেন। অন্য কয় জন অংশীদার হইল সত্য কিন্তু তিনি নিজে কারবারের সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন। এজন্য তিনি কখন আলস্য করিতেন না। "আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে" একটী প্রবাদ বাক্য আছে। একথার যাথার্থ্য জেমসেটজী বিলক্ষণ বুঝিতেন। বোম্বইয়ে স্থায়ী হইয়া বসিবার কয়েক বৎসর মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিলেন। ১৮২২ খৃঃ অঃ মধ্যে তিনি দুই কোটী টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। জেমসেটজী এখন লক্ষ্মীর বরপুত্র। তাঁহার বাণিজ্যে ত লক্ষ্মী বাস করিতেছিলেন এক্ষণে তাঁহার বাটীতেও চঞ্চলা কমলা অচলা হইলেন। শ্রীমন্ত সওদাগরের কথা এখনও কতলোক আগ্রহ ও ভক্তিসহকারে শুনিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস যে লক্ষ্মীর ভক্ত শ্রীমন্তের সাধনার

কথা শুনিলে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ হয়। যদি তাহা হয় তবে আশা করা যায় যে জেমসেটজী কমলার প্রীতি লাভের জন্য জীবনে যে মহীয়সী সাধনা করিয়াছিলেন সেই পুণ্যপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া দরিদ্র ভারতের যুবকবৃন্দ বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

একে একে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহারাজ রামবর্ম্ম, স্যার মাধব রাও, স্যর সলর জঙ্গ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যর সৈয়দ আহম্মদ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, স্যর মথুস্বামী আর্য্য, শ্যামাচরণ সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, রাম দুলাল সরকার এবং স্যর জেমসেটজী জিজিভাইয়ের সধনার পুণ্যপ্রসঙ্গ বিবৃত হইল। কর্ম্মক্ষেত্রে, সাধন-ভূমিতে, সাধক ইহাঁদের পুণ্যপ্রসঙ্গ শ্রবণে আশান্বিত হইবেন। এই সকল মহাপুরুষগণের সাধনার পুণ্যপ্রসঙ্গ ঘটনাবৈচিত্রে পূর্ণ। ইহাঁদের সাধনার মূলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়াছি। আর সেই সঙ্কল্পের অন্তরালে তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা দেখিয়াছি।- এক্ষণে তাঁহাদের সাধনার পুণ্যপ্রসঙ্গের শেষে একবার তাঁহাদের কার্য্যকলাপের পুন-রালোচনা করা যাউক। দেখা যাউক তাহা হইতে আমরা কি শিখিতে পারি। মহাপুরুষচরিত আলোচনা করিতে যাইলে আমরা সর্ব্ব প্রথমে কয়েকটী গুণ দেখিতে পাই। বিশ্বাস, আশা, সাহস এবং অধ্যবসায়ের চিহ্ন আমরা তাহাদের সর্ব্ব কার্য্যে দেখিতে পাই। ভগবানের কৃপায়, আত্মশক্তিতে এবং কর্ম্মের ঔচিত্যে ও উপকারিতায় ইহাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যায়। আশায় তাঁহারা ভগবানের অভয় ও আশ্বাসবাণী শ্রবণ করেন। মহাপুরুষগণ বীরপুরুষ। উত্তাপবিহীন বহ্নি যেমন নিরর্থক, সাহসবিহীন মহাপুরুষ শব্দও তেমনি নিরর্থক। সাহসের সাহায্যে মহাপুরুষগণ সকল ভয় অতিক্রম করেন সকল বিঘ্ন বিপত্তির

সম্মুখীন হয়েন। আর অধ্যবসায়ের সাহায্যে প্রাণপাত করিয়া সাধনায় রত থাকেন। মহাপুরুষগণ উত্তম গুণ সম্পন্ন। তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া কবি যথার্থই বলিয়াছেন ঃ—

বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্য মানাঃ
আরদ্ধমুত্তম গুণাঃ সততং বহন্তি।

মহাপুরুষগণ দায়ভাগ, মিতাক্ষরা বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার বিধির অতীত উত্তরাধিকারিত্বে বিশ্বাস করেন। লোকে জায়াতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজেই যেমন পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়, মহাপুরুষগণ তেমনি প্রকৃতির গর্ভে কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্যই তাঁহারা অজর অমর হইয়া সর্ব্ব শুভ কর্ম্মের চিন্তা ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাপুরুষগণের যে যে লক্ষণ বলা গেল, বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থ বর্ণিত মহাপুরুষগণের চরিত্রে ঐ সকল গুণ দেখিতে পাইব। তাঁহাদের সাধনায় ঐ সকল গুণ ও ভাবের প্রবলতা দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের উজ্জল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আশান্বিত হইয়া সাধনায় রত থাকিতে পারিব আর তাঁহাদেরই মত

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন
শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন"

এই মহাবাক্য বলিতে শিখিব।

সিদ্ধি।

সাধনা পুরুষকার সাপেক্ষ। সিদ্ধি দৈবাধীন। ভগবানের একটী নাম সিদ্ধিদাতা। বাস্তবিক ভগবানই সিদ্ধিদান করেন। এবং সেই জন্যই সাধকগণ সিদ্ধি দৈবাধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কর্ম্মে মাত্র মানবের অধিকার, কিন্তু কর্ম্মফলে তাহার অধিকার নাই। সাফল্য মানবাধীন ব্যাপার নহে। মানব কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিবে। মানব কর্ত্তব্যের অনুরোধে সাধনা করিবে। সিদ্ধি, অসিদ্ধি, জয়, পরাজয় চিন্তা করা তাহার উচিত নহে। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। কি ধর্ম্মক্ষেত্রে আর কি কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই প্রকৃত সাধকগণকে ঐরূপ ভাবে সাধনা করিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা সিদ্ধি দৈবাধীন বলিয়া যেমন বিশ্বাস করেন তেমনই প্রকৃত সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করেন। ইহা তাঁহাদের অন্ধবিশ্বাস নহে। কারণ HEAVEN HELPS THOSE WHO HELP THEMSELVES. তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন ভগবান ভক্তের অধীন। প্রকৃত সাধক ও ভক্ত একার্থ বাচক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সিদ্ধি দৈবাধীন ইতি বিশ্বাসের জন্য ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীরের সাধনার কোন ব্যাঘাত হয় না। অধিকন্তু মহাপুরুষগণ সর্ব্বকর্ম্মে দেশ কাল ও পাত্রের কথা সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া থাকেন। এবং সেই জন্য জীবদ্দশায় সাধনার সিদ্ধি না হইলে তাঁহারা নিরাশ বা ভগ্নহৃদয় হয়েন না। জীবন ও কাল যে অনন্ত তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন। জগত ও জীবের অনন্ত উন্নতিতে তাঁহারা ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করেন। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে "উত্তরাধিকারিত্বে" তাঁহাদের আশ্চর্য্য বিশ্বাস। সংসারী ও বিষয়ী লোক পুত্র

পৌত্রাদির জন্য বিষয় বিভব করিয়া যান। মহাপুরুষগণও তেমনই জগতের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। জীবদ্দশায় সঙ্কল্পের জীব সাধনা সাহায্যে উদ্ভিন্ন না হইলে তাঁহারা বীজের শক্তিতে সন্দিহান হয়েন না। কালে তাঁহাদের উপ্ত বীজ উদ্ভিন্ন হইবে পরে তাহাই পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইবে এবং যথা সময়ে তাহা ফলবান হইবে·ইহা তাঁহারা আশার চক্ষে দেখেন এবং চাক্ষুষ সত্যের ন্যায় বিশ্বাস করেন। ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে বা কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চ অঙ্গের সাধকগণ সিদ্ধির বিষয় এইরূপই ভাবিয়া থাকেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সাহিত্য শিল্পবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণকে উচ্চ অঙ্গের সাধক বলা যায়। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের জীবনী পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তাঁহারা জীবদ্দশায় সাধনার আংশিক সিদ্ধিমাত্র দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুর বহুকাল পরে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম জনসাধারণে গ্রহণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব জীবদ্দশায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বহুল প্রচার দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে প্রিয়দর্শন অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। মহাত্মা যীশু যখন ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করেন তখন তাঁহার কয়জন শিষ্য ছিলেন? স্বীয় দেহের শোণিত দিয়া যে ধর্ম্মের বীজ জগতে বপন করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে তাহা অঙ্কুরিত হয়। এক্ষণে সেই অঙ্কুর মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া কত শত নরনারীকে শান্তি দিতেছে। মহম্মদ ও জীবদ্দশায় অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। নানক এবং শ্রীচৈতন্য ও জীবদ্দশায় তাঁহাদের সাধনায় অনেক বিঘ্ন পাইয়াছিলেন। যাহারা এই সকল মহাপুরুষগণকে তাঁহাদের জীবদ্দশায় নিগৃহীত করিয়াছিল, ইহাঁদের সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল, ইহাঁদের

কার্য্যের সাফল্যে সন্দেহ করিয়াছিল তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল তাহারা কত অদূরদর্শীছিল এখন আমরা তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু মহাপুরুষগণ তখনই তাহাদিগকে অদূরদর্শী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্য সাধনায় কখন শিথিল প্রযত্ন হয়েন নাই। কালে যে তাঁহাদের সাধনা সফল হইবে ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এখন আমরা কার্য্যতঃ তাঁহাদের বিশ্বাসের সাফল্য বুঝিতেছি। ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মবীরগণ সম্বন্ধে এখানে অতি সংক্ষেপে যাহা উল্লেখ করা গেল তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে তাঁহারা সিদ্ধি সম্বন্ধে কি ভাবিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে শিল্পবিজ্ঞানবিদগণের কথা সমালোচনা করিলেও দেখিতে পাইব যে তাঁহারা আপন আপন জীবদ্দশায় সাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। বর্ত্তমানযুগে শিল্পবিজ্ঞানের নানা জটিল কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা তাড়িত ও বাষ্পের কথা উদাহরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি।

শিল্প বিজ্ঞান বিস্তার যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহারা সকলে জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধিলাভ করিয়া যাইতে পারেন না। কোথাও কোথাও কেহ কেহ কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব তাঁহাদের মৃত্যুর বহুকাল পরে সম্পূর্ণ হয়। অথবা সম্পূর্ণহয়ই বা কি করিয়া বলিব? সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল ক্রমবিকাশশীল। তাড়িৎ সম্পর্কীয় যে সকল সত্য মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন অবগত হইতে পারিয়াছিলেন সেইগুলিকে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার সিদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে আমরা ভ্রমে পতিত হইব। ঐরূপ কথা বলিলে বৈজ্ঞানিক সত্যের গতির প্রসার খর্ব্ব করা হয়। ফ্রাঙ্কলিন যখন তাড়িৎ বিষয়ক কয়েকটী তথ্য আবিষ্কার করেন তখন তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে তাড়িৎ

বিষয়ক আরও বহুবিধ তথ্য প্রকৃতির ভাণ্ডারে সুরক্ষিত ও লুক্কায়িত আছে। তাঁহার জীবন অবসান হইবার পরেও আরব্ধ সাধনার শেষ হইবে না। অধিকন্তু তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তদীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই সাধনায় রত থাকিবেন এবং ক্রমে ক্রমে কঠোর সাধনা যোগে এক একটী সত্য প্রকৃতির নিকট হইতে অবগত হইবেন এবং তদ্দ্বারা জীবজগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং এরূপ স্থলে ফ্রাঙ্কলিন যে কয়টী তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সাধনার আংশিক সিদ্ধিমাত্র বলা যাইতে পারে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ—গালভানি, গস, ওয়েবর, ষ্টীনহিল, হুইষ্টোন মর্স, এডিসন, রঞ্জন, মারকণি, বসু প্রভৃতি সাধকগণ—তাড়িৎ তত্ত্ব সাধনায় রত থাকিয়া কত নূতন নূতন কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এইজন্য বলিতেছিলাম মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন আংশিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কে জানে কবে এ কঠোর সাধনায় সর্ব্বাঙ্গীণ সিদ্ধি হইবে।

বাষ্পশক্তি সম্বন্ধে ও এইরূপ বলা যাইতে পারে। জেমস্ ওয়াট্ সাধনায় যে ফললাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পরবর্ত্তী ট্রেবিথিক এবং ভিবিয়ান সে সাধনায় অধিকতর ফললাভ করিয়াছিলেন। শেষে রবার্ট ষ্টিফেন্সন যথারীতি বাষ্পীয় পোতাদি চালাইয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণের অপেক্ষা অধিকতর সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানযুগে দৈহিক শক্তি ও বাষ্পশক্তিতে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। শকট ও অর্ণবযানচালন, মুদ্রণ, বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য হইতে প্রকোষ্ঠে বায়ু ব্যজন পর্য্যন্ত বাষ্পশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে।* ওয়াট, ট্রেবিথিক, ভিবিয়ান, ষ্টিফেন্সন

* তাড়িৎ শক্তি দ্বারা বাষ্পশক্তিকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে এবং বহুবিধ কল কারখানাও তাড়িৎ শক্তিতে এখন চালিত হইতেছে।

প্রমুখ সাধকগণ তাঁহাদের সাধনার যে ফল পাইয়াছিলেন তাঁহাদের ভবিষ্যবংশীয়গণ সেই সাধন ভূমিতে অধ্যবসায় সহকারে সাধনা করিয়া উত্তর কালে আরও কত অচিন্তনীয় অভিনব শক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া জীবজগতের কত কল্যাণ করিবেন তাহার ইয়ত্তা এখন কে করিতে পারে?

তাড়িৎ ও বাষ্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের সাধনা ও সিদ্ধির কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল মাত্র। বিজ্ঞানের বহু বিভাগ আছে এবং সে সকলের বহুতর সাধক আছেন। এখানে সে সকল কথার আলোচনার আবশ্যক নাই। উদাহরণের জন্য যাহা বলা হইল তাহা হইতে আমরা এই বুঝিলাম যে, যাঁহারা কর্ত্তব্যবোধে সাধনা করিবেন তাঁহাদের সিদ্ধির জন্য একান্ত ব্যগ্র হওয়া ঠিক নহে। সাধনায় দেহপাত করাতেও শ্রেয়ঃ আছে। প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলেও সাধনাতে যে সন্তোষ পাওয়া যায়, একথা প্রত্যেক সাধকেই অবগত আছেন। সাধনায় গৌরব আছে, সম্মান আছে। সাধন ভূমিতে সাধনা করিতে করিতে যাঁহারা দেহপাত করেন তাঁহারাও সিদ্ধ-পুরুষগণের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রকৃত সাধকের পক্ষে ইহা বড় সামান্য সাধনা নহে। সাধু সঙ্কল্প লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও আশার সহিত সাধনা করিতে হইবে। ইহাতে জীবদ্দশায় যদি সিদ্ধিলাভ ঘটে ত পরম মঙ্গল। অন্যথা দুঃখিত বা ভগ্নোদ্যম হওয়া উচিত নহে। কারণ প্রকৃত সাধনা কখন ব্যর্থ হয় না। কালে সাধনা সফল হয়। নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও আশার সহিত সাধনা করিলে যথা সময় সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি দেন ইহাই সিদ্ধপুরুষগণের উক্তি। প্রকৃত সাধক উহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং সাধনাই সিদ্ধির সুগম পথ।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সাধনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে তাঁহার সাধনার ফল তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ভোগ করিতেছেন এবং উত্তর কালে আরও অধিকতর ভাবে করিবেন। ব্যক্তিগত সুখ স্বচ্ছন্দ মান সম্ভ্রমের কথা উত্থাপন করিতে গেলে এই কথা স্পষ্টই বলিতে হইবে যে রাজা রামমোহন রায় ঐ সকল বিষয়ে সৌভাগ্যবান ছিলেন। তিনি দেওয়ানের কর্ম্ম বিশেষ খ্যাতি ও সম্মানের সহিত করিয়াছিলেন। রংপুরে দেওয়ানী কর্ম্ম ত্যাগ করার পর তিনি পৈত্রিক বিষয় বিভবের একমাত্র অধিকারী হওয়াতে তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দের অভাব ছিল না। হিন্দু সমাজের মধ্যে তাঁহার অনেক শত্রু ছিল সত্য ; কিন্তু তথাপি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতার জন্য দেশের উচ্চতম রাজপুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দিল্লির সম্রাট্ তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা সম্রাটের কতকগুলি কার্য্যের জন্য এবং স্বদেশের হিতের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেই সুদূর দেশেও তিনি যথেষ্ট আদর ও সম্মান পান। ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়মের অভিষেক উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায় য়ুরোপীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণের সহিত সমান সম্মান পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়ম তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তাহার পর রাজা যখন ফরাসী দেশে গমন করেন তখন সেই দেশের রাজা লুইফিলিপ রাজা রামমোহন রায়কে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করেন। ফরাসীরাজ লুইফিলিপ দুইবার রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার সহিত আহার করেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার গুণগ্রামের কথা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন অনেক সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত রাজার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ কবি

ক্যাম্বেল রাজার কথা বলিয়া গিয়াছেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্রাউহাম সাহেব তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। উইলিয়ম রস্কো রাজার সহিত পরিচিত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হয়েন। ঋগ্‌বেদ সংহিতার অনুবাদক রোজেন সাহেব রাজার সহিত বেদ বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহেন। জনহিতৈষী দার্শনিক বেন্‌থাম রাজার গুণগ্রামে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে মানবহিতৈষী বলিয়াছিলেন। বিদেশে অবস্থান কালে তিনি এইরূপে সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। সাধক বলিয়া তিনি ঐরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন। স্বদেশের হিতসাধনা করিতে করিতে রাজা বিদেশে দেহত্যাগ করেন। ব্রিষ্টলে তাঁহার সমাধি হয়। উহা এখন স্বদেশ-হিতৈষীগণের পুণ্যতীর্থ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। সেই সমাধির উপর রাজার সাধনার কথা সংক্ষেপে এইরূপ লিখিত আছে:—

"Beneath this stone rest the remains of RAJA RAMMOHAN RAY. A conscientious and steadfast believer in the unity of Godhead he consecrated his life with entire devotion to the worship of the Divine spirit above. To great Natural talents he united a thorough mastery of many languages and early distinguished himself as one of the greatest scholars of the day. His universal labours to promote the social, moral and physical condition of the people of India, his earnest endeavours to supress idolatry and the rite of Sati and his constant zealous advocacy of whatever tended to advance the glory of God and the welfare of man, live in the greateful remembrance of his country men."

কীর্ত্তিমন্দিরে ভক্তগণের ভাষায় সাধকও ও সিদ্ধপুরুষগণের স্তুতি-

গান করা পুণ্য কর্ম্ম। একজন বৈদেশিক ভক্ত—ভট্ট মোক্ষমূল—রাজার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া রাজার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

The German name for Prince in Fürst ; in English First—he who is always to the fore ; he who courts the place of danger ; the first in fight the last in flight. Such a Fürst was RAMMOHAN RAY—a true prince, a real Raja if Raja also, like Rex originally meant the steersman, the man at the helm."

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একজন পরম ভক্তের স্তুতিগাথায় আমরা রাজার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার কথা এখানে শেষ করিতেছি। ভারতীয় যুবকগণ তাঁহার স্তুতিগাথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদরাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নহে। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয়ে জঙ্গলময় পঙ্কিল ভূমি পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল, তাহা হইতে পুণ্যপবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূলপক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহা যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তুর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশে জয় সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশব্যাপী ভ্রম ও

কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়িরূপ দুর্ম্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ এবং বিচার যুদ্ধে সকল বিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যকরূপ জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটী সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তর কালীন সুমার্জ্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দু জাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার পতাকা তাঁহাদের স্বাধিকারের মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে আর পতিত হইল না হইবেও না নিয়ত একভাবেহ উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষের কেন, তুমি জগতের বন্ধু।" (অক্ষয়কুমার দত্ত)

মহারাজ রাম বর্ম্ম রাজসিংহাসনে বসিয়া যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহা বিফলে যায় নাই। মহারাজের আদর্শ আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে। স্বীয় রাজ্যের উন্নতিকল্পে অসাধারণ সাধনা সাহায্যে মহারাজা যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার স্মৃতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে চিরকাল রক্ষিত হইবে। ত্রিবাঙ্কুরের শিল্প বিদ্যালয়, কুইলনের কাপড়ের কল, পুনালুরের কাগজের কল, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার সিদ্ধির অন্যতম পরিচয়।

মহারাজের বিবিধ বিষয়ের সাধনার পরিচয় পাইয়া বিভিন্ন দেশের বিদ্বৎসমাজ তাঁহাকে নানা উপাধিতে সম্মানিত করেন। বিবিধ

সজ্জন সমাজের সহিত তাহার নাম গ্রথিত আছে। মান্দ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম সভ্য ছিলেন। বিদেশে লিনিয়ান সোসাইটী তাঁহার উদ্ভিদ্বিদ্যার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সদস্যের পদে বৃত করেন। ভৌগোলিক সমাজ তাঁহাকে সভ্য নিযুক্ত করেন। মহারাজ বিলাতে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার অত্যধিক বিদ্যানুরাগের কথা সুদূর ফরাসী দেশেও প্রচারিত হয়। তত্রস্থ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে Officer de l' Instrunction Publique পদে বৃত করিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্যারিস নগরস্থ Societe des Etente colonial a maritime সমাজ তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে Knight Grand commandership of the most Exalted order of the Star of India উপাধিতে বিভূষিত করেন।

কথিত আছে স্বদেশে রাজা পূজিত হয়েন কিন্তু বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজিত হয়েন। রামবর্ম্ম উভয় গুণের অধিকারী ছিলেন। রাজা হইয়া সাধন গুণে তিনি বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েন এবং সেই জন্য কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছেন। তাঁহার সাধনার ফল তিনি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

স্যর মাধব রাও ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যে যে যে হিতকর সংস্কারের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বিবিধ হিতকর বিধান তাঁহারই কীর্ত্তির পরিচায়ক। সচিব প্রবর ত্রিবাঙ্কুর ও হোলকার রাজ্যে যে সকল শুভকার্য্যের সূচনা করিয়া আসেন কালে সেগুলি সম্পন্ন হইয়া তাঁহারই অদম্য ইচ্ছাশক্তির কথা প্রচার করিতেছে।

সর্চিব প্রবরের প্রধান সাধনক্ষেত্র বরোদা। একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই খানে চিরবন্ধুর রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তন্ত্রে সিদ্ধপুষগণ সম্বন্ধে কথিত আছে যে তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন করিতে পারেন। সচিব স্যর মাধব রাও রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সাধনার সিদ্ধি লাভ করেন তাহা দ্বারা তিনিও ইচ্ছামাত্রে বরোদার কত অসাধারণ ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় বরোদার রাজশ্রী বৃদ্ধি পায়। সেই কর্ম্মবীরের চেষ্টাতে গাইকোয়াড়ের রাজ্য মধ্যে নানা স্থানে সুবিচারের জন্য ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিবিধ জ্ঞানের আগার পুস্তকালয় এবং অন্যান্য বহুবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। সুশাসনের জন্য, রাজকার্য্য সুন্দররূপে পরিচালনার জন্য, বোম্বাইও মান্দ্রাজ হইতে অনেক শিক্ষিত চরিত্রবান ও কর্ম্মঠ লোক আনাইয়া নিযুক্ত করেন। সচিব প্রবর এই শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করিয়া রাজার ও রাজ্যের অশেষ কল্যাণ করিয়াছিলেন। কারণ শাস্ত্রে কথিত আছে :—

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানেহি সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গ নিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ।

প্রকৃত পক্ষে তাঁহার এই প্রকার সুবন্দোবস্তের জন্য গাইকোয়াড়ের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল।

স্যর মাধব রাওয়ের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের সফলতা দেখিয়া বাস্তবিক তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার কঠোর সাধনার্জ্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কুশলতার জন্য তাহার সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ এবং সাহায্য পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। বরোদার রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের

পুরও তিনি মান্দ্রাজের গভর্ণর ও গভর্ণর জেনেরেল কর্ত্তৃক মন্ত্রণাসভায় আহূত হয়েন। জর্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক আফ্রিকার অধিকার বিষয়ে তিনি প্রিন্স বিসমার্ককে পরামর্শ দেন। এবং এজন্য সেই স্বনামখ্যাত জার্ম্মাণ মন্ত্রী স্যর মাধব রাওকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দেন। স্যর মাধব রাওয়ের সুপরামর্শ জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত করিয়া প্রত্যেক জার্ম্মাণ সৈন্যকে দেওয়া হয়। সচিব প্রবরের উপদেশেরমূল্য যে কত মূল্যবান তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। তিনি স্বদেশের হিতকল্পে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় যুবকগণ স্যর মাধব রাওয়ের জীবন এবং উপদেশ উভয় হইতেই শিক্ষা লাভ করুন এবং দেখান যে শিক্ষিত সচ্চরিত্র ও কর্ম্মঠ ভারতীয় যুবক সর্ব্ব প্রকারে রাজা ও রাজ্যের সেবা করিবার উপযুক্ত।

মহাপুরুষগণের গুণ গান করিলেও পুণ্য হয়। তদ্দ্বারা লোকে সদ্‌গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দুইজন প্রথিতনামা ইংরাজ স্যর মাধব রাওয়ের যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Within the short space of a year, MADHAVA RAO has called forth order out of disorder; has distributed justice between man and man, without fear or favour; has expelled dacoits; has raised the revenues; and his minutes and State papers show the liberality, the soundness and statesmanship of his views and principles. He has received the thanks of his sovereign; he has obtained the voluntary admiring testimony of some of the very missionaries who memorialized, to the excellence of his administration. Now, here is a man raised up as it were amid the anarchy and confusion of his country to save it from destruction. Annexation

looming in the not far distant future, would be banished into the shades of night if such an administration as he has introduced into two of the districts were given to the whole kingdom, by his advancement to the post of minister. He is indeed, a splendid example of what education may do for Native. "John Bruce Norton."

সচিব মাধব রাও দেশীয় রাজন্যবর্গের মন্ত্রিত্ব করিলেও ব্রিটিস-গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন। এবং ইংরাজরাজ তাঁহার গুণের আদর করিতে ক্রটী করেন নাই। ১৮৭৮ সালের দিল্লীর দরবারে তিনি "রাজা" উপাধি পান। তৎপূর্ব্বে K. C. S. I. উপাধি পান। এই উপলক্ষে মান্দ্রাজের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড নেপিয়র সচিব প্রবরের যে প্রশংসাবাদ করেন তাহা উল্লেখ যোগ্য।

"Sir Madhava Rao—The Government and the people of Madras are happy to welcome you to a place where you laid the foundation of those distinguished qualities which have become conspicuous and useful on another scene. The mark of Royal favour which you have this day received will prove to you that the attention and generosity of our Gracious Sovereign are not circumscribed to the circle of her immediate dependents but Her majesty regards the faithful service rendered to the Princes and people of India beyond the boundaries of our direct administration, as rendered to Herself and to her representatives of this Empire. Continue to serve the Maharaja industriously and wisely reflecting the intelligence and virtues of His Highness faithfully to His people."

বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে সচিব প্রবর স্যর মাধব

রাওয়ের ন্যায় স্যর সলরজঙ্গও একজন কৃতী পুরুষ। হাদ্রাবাদের কল্যাণের জন্য তিনি যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সে কঠোর সাধনায় তিনি অনুরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নিজামের মঙ্গল কামনায় তিনি আপনার ধন প্রাণ সমূহ বিপন্ন করিয়াও নিজামের সৈন্যগণকে বিদ্রোহী সিপাহিগণের সহিত মিলিত হইতে দেন নাই। সমগ্র হায়দ্রাবাদ এক দিকে—আর স্যর সলরজঙ্গ এক দিকে। ইংরাজের মঙ্গলে ভারতের মঙ্গল—ভারতের মঙ্গলে হায়দ্রাবাদের মঙ্গল একথা সলরজঙ্গ বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন। সমস্ত রাজ্যের আগ্রহ স্যর সলরজঙ্গের ইচ্ছাশক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তির এতাদৃশ প্রবলতা সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবে না। বিটি্রসরাজ গুণ গ্রাহী। স্যর সলর জঙ্গের বন্ধুতা ও দূরদর্শিতার জন্য ইংরাজ রাজ বিদ্রোহান্তে সুখের দিনে ৩০০০০ টাকা মূলের একটী খিলাত উপহার দেন। এবং এই সময়ে তদানীন্তন বড়লাট তাঁহার দক্ষতা সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্যর সলর জঙ্গ তদীয় অসাধারণ সাধনাসম্ভূত অভিজ্ঞতা ও শক্তির দ্বারা নিজামের রাজ্যকে নানা প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিল। যে নিজামকে এক দিন কেহ সামান্য ঋণ দিতে ইতস্ততঃ করিত, সেই নিজামের কোষাগার সলর জঙ্গের বন্দোবস্তের গুণে ধন রত্নে পূর্ণ হয়। এ সকলই তাঁহার সাধনার সিদ্ধি মাত্র। শেষে সকলেই তাঁহার অন্যান্য সাধারণ শক্তির পরিচয় পান এবং তাঁহকে তদনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করেন। মহারাণী ভিকটোরিয়া তাঁহাকে G. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত করেন। স্যর সলর জঙ্গ যখন নিজামের

হিতার্থে বিলাত যান তখন অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি D. C. L. উপাধি পান। লণ্ডনের লর্ডমেয়র তাঁহাকে লণ্ডনের নাগরিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করেন। এইরূপে কি স্বদেশে কি বিদেশে তিনি সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন। মহাপুরুষকে সম্মান করা মনুষ্যোচিত কার্য্য। বীরপূজা বীরের লক্ষণ। গুণীই গুণের আদর করিয়া থাকে। যে দিন ভারতের যুবকগণ বীর পূজা করিতে শিখিবেন সেই ভারতের সৌভাগ্যের সূচনা। ভগবান করুন সে দিন নিকট হউক। শিক্ষা ও সৌভাগ্যবলে যে সকল ভারতীয় যুবক রাজনীতি ক্ষেত্রকে কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিবেন তাঁহারা যেন স্যর মাধব রাও এবং স্যর সলর জঙ্গের উজ্জ্বল আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েন, এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন আর তাঁহাদেরই মত ব্রিটনের বন্ধু হইয়া রাজা এবং রাজ্যের সেবা করেন।

স্যর সলর জঙ্গের জীবদ্দশায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতেও ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সেইরূপ সসম্মান শোক প্রকাশ করেন। স্যর সলর জঙ্গের মৃত্যুর পর ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট Gazette Extraordinary তে এইরূপ লেখেন :—

"It is with feeling of great regret that the Governor General in Council announces the death of His Excellency Nawab Sir SALAR JUNG G. C. S. I., the Regent and Minister of the Hyderabad State. By this unhappy event the British Government has lost an enlightened and experienced friend, His Highness the Nizam, a wise and faithful servant, and the Indian Community one of its most distinguished representatives."

ব্রিটিশ বঙ্গে এ পর্য্যন্ত যত কর্ম্মবীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান। বঙ্গের অশেষবিধ কল্যাণসাধনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় অতি অল্প লোকই সমগ্র মন প্রাণ দিয়া খাটিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত। বিদ্যালয়ে, বঙ্গসাহিত্যে, জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে, সমাজ সংস্কারে তিনি সাধনা করিয়াছেন। আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাঁহার সমগ্র সাধনা ও তাঁহার সিদ্ধির সবিশেষ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। আমরা তাঁহার বিদ্যালাভ ও বিদ্যাবিস্তারের কথাই মুখ্যতঃ বলিয়া আসিয়াছি। কিরূপ কঠোর সাধনা করিয়া তিনি বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন পূর্ব্বে তাহা সবিস্তর কথিত হইয়াছে। দরিদ্র বাঙ্গালী ছাত্র তাঁহার উজ্জ্বল ও পবিত্র আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়া গৌরবান্বিত হউক। বিদ্যাসাগরের বাল্যের সহিত দারিদ্র্য সংযুক্ত থাকাতে যেন ছাত্রের পক্ষে দারিদ্র্য শ্লাঘনীয় হইয়াছে। জ্ঞান সাধনায় ঈশ্বরচন্দ্র সিদ্ধি লাভ করিয়া বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত পক্ষেই বিদ্যাসাগর ছিলেন।

বঙ্গদেশে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেই সঙ্কল্পের তিনি মহীয়সী সাধনা করিয়াছিলেন। সে সাধনায় তিনি মনোমত সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকাবলী আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিদ্যা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে কত শত ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনে যশস্বী হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজ আজ বেসরকারী কলেজের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এখন ভারতবর্ষে কত কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা দেশে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। আজ ভারতের

শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তনকালে সকলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দোহাই দিতেছেন। শিক্ষিত বঙ্গের গৃহে গৃহে বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। তাঁহার সেই পবিত্র প্রতিমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া ভক্তিভরে প্রাচীন বঙ্গ, নবীন বঙ্গকে পরিচয়চ্ছলে প্রতিনিয়ত যেন বলিতেছেন :—

"শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোঽহয়ং বিদ্যাসাগর-সংজ্ঞক

ভূদেবকুলসম্ভূতো মূর্ত্তিমদ্দৈবতং ভুবি"!!

পূর্ব্বে বলিয়াছি ঈশ্বরচন্দ্রকে সগুণ ঈশ্বরের ন্যায় নানা লোকে নানা ভাবে পূজা করেন। দীন জন তাঁহাকে দয়ার সাগর নাম দিয়াছেন। তাঁহাদেরই এক জন দুঃখের দিনে বিদেশে বিপন্ন হইয়া বিদ্যাসাগরের যে স্তুতি গান করিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ যোগ্য। বঙ্গের সেই দীন অমর কবির কথায় আমরাও সেই মহাপুরুষের পূজা করিয়া ধন্য হই।

বিদ্যারসাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে!
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী,
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল দাস-রূপ ধরি;
পরিমলে ফুলকুল দশদিশ ভরে,

দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

কর্ম্মবীর মহাপুরুষ ঈশ্বর চন্দ্র বাঙ্গালীর চক্ষে সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধ-পুরুষের পূজা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সেই বিশ্বাসে শিক্ষিত বঙ্গ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

"যাও দেব স্বর্গপুরে করগে বিশ্রাম
পাইয়া দেবের দয়া ভুল না সকল মায়া
স্মরিও স্মরিও দেব ভারতের নাম।
অভাগিনী বঙ্গভাষা করিও মঙ্গল আশা
বালবিধবার প্রতি হ'য়ো নাকো বাম।
দরিদ্র বাঙ্গালীগণে জাগাও জাগাও মনে
মরণে না হয় যেন চির পরিণাম।"

বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে স্যর সৈয়দ আহম্মদের স্থান অতি উচ্চ। অনেকে বিবেচনা করেন স্যর সলর জঙ্গের পরই স্যর সৈয়দের নাম উল্লেখযোগ্য। তুলনায় সমালোচনা আবশ্যক নাই। প্রত্যেককে তাঁহার সাধনভূমিতে দেখিয়া তাঁহার সিদ্ধির কথা আলোচনা করায় লাভ আছে। আলিগড়ের এ, ও, কলেজ স্যর সৈয়দের প্রধান কীর্ত্তি-মন্দির। মুসলমান সম্প্রদায়ের সুশিক্ষার জন্য যে মহীয়সী সাধনা স্যর সৈয়দ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কৃতী পুরুষ ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ প্রায় সকল কর্ম্মেই তিনি সফলকাম হয়েন। তাঁহার দেহান্তের পর মুসলমান সম্প্রদায়ের সুশিক্ষার জন্য এবং তাঁহার স্মৃতি স্থায়ী করিবার জন্য মহম্মদীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় মুসলমানসমাজ বিশেষ প্রয়াস পান। তাঁহার স্মৃতিসভায় লর্ড

এল্‌গিন উপস্থিত থাকেন। তিনি স্যর সৈয়দের স্বদেশ-প্রীতি স্বজাতি-হিতৈষিণা এবং রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চারের প্রয়াস বিশেষভাবে প্রশংসা করেন।

ভারতের পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান রাজাদের অনেক কীর্ত্তি আছে। দিল্লীতে কুতবমিনার এখনও উচ্চশিরে মুসলমান নৃপতির কাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া মিনার মন্দির-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা তত আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু প্রজা হইয়া, সবিশেষ চেষ্টা করিয়া, ভিক্ষা করিয়া, সাধারণের হিতের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা অতিশয় প্রশংসার্হ। স্যর সৈয়দ প্রতিষ্ঠিত আলিগড়ের বিদ্যা-মন্দির এইরূপ প্রশংসার্হ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির দিল্লীর সন্নিকটস্থ নগরে স্থাপিত হইয়া দিল্লীর নৃপতিগণের স্থাপিত কীর্ত্তিমন্দিরের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছে।

কি বর্ত্তমান সময়ে, আর কি সুদূর ভবিষ্যতে, যে কোন ভাবুক লোক ভারতের পশ্চিম প্রদেশে মুসলমানদিগের কীর্ত্তিকলাপ দেখিবার জন্য যাইবেন, তিনি দিল্লীতে রাজার এবং আলিগড়ে প্রজার কীর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। অধিকন্তু তিনি তথায় মুসলমানগণের কৃতজ্ঞতা-সিক্ত স্মৃতিক্ষেত্রে, জ্ঞানের আলোক হস্তে স্যর সৈয়দের মানষীমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

সংসারের সাধনা শেষ করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারানাথ ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কাশীবাস করেন। তিনি যখন সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। যে সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার তাঁহার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, তাহা তিনি এক প্রকার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে তদীয় পুত্র এক শত সাত খানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সটীক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত

করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে নানাদেশের বিদ্যার্থিগণ বিদ্যা লাভ করিতেছেন। দেব ভাষা প্রচারের জন্য তিনি যে কঠোর এবং আজীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কর্ম্ম তাঁহার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল। কাশীতে যে অল্পকাল ছিলেন সে সময়েও তিনি সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন। রাজযোগ এবং হঠযোগের সাধন প্রক্রিয়া ও অন্যান্য নিগূঢ় তত্ত্ব সকল দণ্ডী ও পরমহংসগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে আসিতেন। সাধক চিরকালই সিদ্ধপুরুষের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অন্যথা এই দণ্ডী সন্ন্যাসিগণ কিরূপে কাশীতে তাঁহার নিভৃতবাস জানিতে পারিলেন ?

কাশীতে অল্পকাল অবস্থানের পর তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দেহান্ত ঘটে। নিষ্ঠাবান ভক্ত হিন্দুর শেষ আশা পূর্ণ হইল। কাশীতল বাহিনী জাহ্নবী তীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁহার সৎকার হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারত প্রকৃত পণ্ডিত শূন্য হইল। এই মহামহোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে দেশীয় হিন্দু রাজন্যবর্গ বিশেষ শোক প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে ত্রিবাঙ্কুরের গুণগ্রাহী মহারাজ রামবর্ম্ম বলেন যে, "তর্কবাচস্পতির মৃত্যুতে ভারতবাসী সংস্কৃত শাস্ত্রের সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত হইল।" মহীশূরের দেওয়ান রঙ্গাচার্লু বলেন যে, "আমাদের বিবেচনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই, কারণ, কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" তাঁহার বাচস্পত্যাভিধান ও অন্যান্য গ্রন্থ সমুদায় যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন তিনি জীবিত থাকিবেন। আর তাহাই প্রকৃত কথা।

> "Thou art a monument without a tomb,
> And art alive still while thy book doth live,
> And we have wits to read and praise to give."

অনেকের ধারণা যে কোন দৃশ্যমান স্থায়ী কীর্ত্তি না রাখিতে পারিলে মহজ্জীবনের মহত্ত্ব থাকে না। এরূপ ধারণা সর্ব্বত্র ঠিক নহে। দেউল জাঙ্গাল, দীঘি, সরোবর, মঠ, মন্দির, দেবালয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ধরিত্রী এ সকল কীর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া এক শ্রেণীর সাধকগণের সিদ্ধির পরিচয় দিতেছে। অপর শ্রেণীর সাধক-গণের কীর্ত্তি অশরীরিণী বাণী মানবের স্মৃতিতে রক্ষা করিয়া থাকেন। স্যর মথুস্বামী আর্য্যের মহজ্জীবনের কাহিনী স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়াছে। স্যর মথুস্বামী নিজের অসাধারণ সাধনার বলে দারিদ্র্য-দানবকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার গুণে ভারতবাসীর প্রাপ্য রাজকর্ম্মের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠকর্ম্ম পাইয়াছিলেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজিয়তি লাভ করা তাঁহার জীবনের কঠোর সাধনার অন্যতম সিদ্ধি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ছাড়া তিনি আর একটী বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেটী তাঁহার আদর্শ জীবন।

স্যর মথুস্বামীর ভক্তগণ তাঁহার তৈলচিত্র রাখিয়াছেন, শিল্পী যথাযোগ্য বর্ণে তুলিকাযোগে সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু এই চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। তিনি নিজের চিত্র, আজীবনব্যাপী সময়ে স্বয়ং চিত্রিত করিয়াছেন। লোকের মানসক্ষেত্রে তিনি তাঁহার আদর্শ জীবন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সেই চিত্রে স্বাবলম্বন, সাহস, নিষ্ঠা, বুদ্ধি, বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, কর্ম্মকুশলতা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি সকল সদ্গুণের বর্ণসমষ্টি দেখিতে পাই। সেই আদর্শ জীবনের বর্ণ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই পিতৃমাতৃহীন যুবক মথুস্বামী স্বাবলম্বন সাহস এবং বুদ্ধির সাহায্যে বিবিধ বিদ্যালাভ করিতেছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মকুশলতার গুণে তিনি কৃতী পুরুষ। গার্হস্থ্যজীবনে দেব

দ্বিজে একান্ত ভক্তিমান্ ক্রিয়াকাণ্ডে একান্ত নিষ্ঠাবান্ এবং পুত্র কলত্রে স্নেহ ও প্রেমশীল।

ব্রিটিস ভারতে দরিদ্র শিক্ষিত দেশীয় যুবকগণের আশার স্থল হইয়া মথুস্বামী আর্য্যের স্মৃতি চিরকাল জাগরুক থাকিবে। স্যর মথুস্বামী আর্য্য বিচারপতি হইয়া ব্রিটিশরাজের ন্যায় বিচারের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্বাবলম্বন থাকিলে, বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রে উপযুক্ত হইলে ইংরাজরাজ যোগ্য পাত্রের গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে কখন কুণ্ঠিত নহেন। ইহা বড় কম আশার কথা নহে। ব্রিটিসরাজের ন্যায়বিচার ও গুণগ্রাহিতার উপর নির্ভর করিয়া, স্যর মথুস্বামী আর্য্যের জীবনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মেধাবী সচ্চরিত্র বিদ্বান দরিদ্র দেশীয় যুবক আশান্বিত হৃদয়ে ইংরাজের ভাষায় চিরকাল বলিবে :

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

Act,—act in the living present !
Heart within, and God o'erhead.
Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime.

সকলের উদ্দেশ্য সমান নহে সুতরাং সকলের আদর্শও সমান হইতে পারে না। সকলের আকাঙ্ক্ষা উচ্চ নহে। সকলের শক্তিও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নহে। বুদ্ধদেব বা যীশু, সেকেন্দর বা নেপোয়িলন সেক্সপিয়র বা কালিদাসের আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি সকলের অনুকরণ যোগ্য নহে। ইহাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অনেক কম আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, যাঁহাদের শক্তি অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। তাঁহারা আপনাদের সম অবস্থাপন্ন

লোকের সিদ্ধি দেখিয়া আশায় উদ্দীপিত হইয়া সাধনা করেন ইহাই পরামর্শসিদ্ধ।

এই হিসাবে শ্যামাচরণ সরকারের সিদ্ধি, সাধারণ সদিচ্ছাসম্পন্ন সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবকের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ। যে দরিদ্র যুবক চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে, সহায় সম্পত্তি না থাকায় ভাগ্যকে নিন্দা করিতেছে, বয়োধিক্যের জন্য বীতরাগ বা ভগ্নোদ্যম হইয়াছে, অথবা অনন্যসাধারণ প্রতিভা, অত্যন্ত প্রখরা স্মৃতি বা বুদ্ধি নাই বলিয়া দুঃখিত, সে একবার শ্যামাচরণ সরকারের উজ্জ্বল আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক, তাহার সমস্ত সংশয় দূরে যাইবে। হৃদয়ে আশায় সঞ্চার হইবে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহার সিদ্ধি দেখিয়া সে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। শ্যামাচরণ সরকার বাল্যে দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত ছিলেন—তাঁহার সহায় সম্পত্তি বা অলৌকিক প্রতিভা ছিল না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ ছিল না। অবস্থার উন্নতি করিয়া সম্পন্ন গৃহস্থের ন্যায় নিজ পরিবার এবং সাধ্যানুসারে সমাজ ও স্বদেশের সেবা করিবেন এই আশা তিনি সতত হৃদয়ে পোষণ করিতেন। এই শুভ সঙ্কল্প তিনি আজীবন ধ্রুবতারার ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া ছিলেন। শ্যামাচরণ "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" এই নীতি বাক্যের অনুসরণ করিয়াছেন। যে বয়সে বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণ ক্ষীণদৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া চোগা চাপকান, সামলা ও চমসায় সুশোভিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, এবং সময়ে সময়ে, ব্যর্থমনোরথ হইয়া সংসারবিরাগী হইতে চাহেন, সেই বয়সে শ্যামাচরণ ইংরাজী বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করেন। আবার যে বয়সে বাঙ্গালী জরাগ্রস্ত হইয়া বিষয়কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া থাকেন, সেই বয়সে প্রবীণ শ্যামাচরণ নবীনের উদ্যমের সহিত ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদ লাভের জন্য বিচক্ষণ দক্ষ ইংরাজ ব্যবহারা-

জীবিদের সহিত প্রাতিযোগিতায় জয়ী হইয়া প্রভূত যশ ও অর্থ লাভ করেন। ঐ অধ্যাপকতার বৃত্তি দশ সহস্র মুদ্রা। এই উপলক্ষে তাঁহার সঙ্কলিত মহম্মদীয় দায়াধিকার বিষয়ক আইন গ্রন্থ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বিষয় ব্যাপারে ভিন্নমত হইলে এখনও মৌলভী, মুফ্‌তি, কাজি ও ইমামগণ এই গ্রন্থের মত প্রামাণ্য বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। শ্যামাচরণ উর্দ্দু, পারসী ও আরবী ভাষার জ্ঞান লাভের জন্য যে সাধনা করিয়াছিলেন মহম্মদীয় ব্যবহার-গ্রন্থে তাহার সিদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আবার সংস্কৃত কালেজে যখন শিক্ষকতায় ব্যস্ত, তখন ছাত্র হইয়া তত্রত্য মহামহোপাধ্যায়গণের অন্তিকে যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করিয়াছিলেন তাহর সিদ্ধি তাঁহার সঙ্কলিত ব্যবস্থাদর্পণ ও ব্যবস্থা চন্দ্রিকায়। বঙ্গের প্রধানতম বিচারালয়ে যখন তিনি দ্বিভাষীর কর্ম্ম করেন সেই সময়ে, অবসর অনুসারে, তিনি উক্ত গ্রন্থ দ্বয় সঙ্কলন করেন। উহার একখানি, তৎকালীন উচ্চ শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। শ্যামাচরণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে নয়টী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাস্তবিক ভাগ্যদেবতার কোন অজ্ঞাত নির্দ্দেশে তিনি উকীলের ব্যবসা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, অন্যথা তিনি ত উকীলগণকে আইন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্যামাচরণের জীবন প্রতিভার কিরীটচ্ছটায় মণ্ডিত নহে সত্য, কিন্তু পরিশ্রমার্জ্জিত গুণগ্রামে তাহা শোভিত। তাঁহার জীবনের অদ্ভুত কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইবার বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহাতে শুনিবার বুঝিবার এবং শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। অবস্থাবিপাকে বিপন্ন হইয়া দারিদ্র্যে বাল্য ও যৌবনের বহুদিন কাটাইয়া, নির্ম্মল চরিত্র, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের গুণে উচ্চ রাজকর্ম্ম, সম্পন্নগার্হস্থ্যজীবন, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কম

প্রশংসার কথা নহে। শ্যামাচরণের সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনী বহুকাল বঙ্গে থাকিবে এবং সম অবস্থাপন্ন সাধকগণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে। জীবনে মরণে যাঁহার সিদ্ধির এরূপ সার্থকতা, তিনি ধন্য।

প্রাণ পাইতে হইলে প্রাণ দিতে হয়। অমর হইতে হইলে মরিতে হইবে। এখন যাঁহার সিদ্ধির কথা বলিতেছি, তিনি বাস্তবিক দেহ পাত করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সত্য সত্যই শরীর পতন করিয়া মন্ত্রের সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প কিরূপ দৃঢ় ছিল তাহা তিনি একস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে উহা উদ্ধরণ যোগ্য :—"যে শুভকর বিষয়ে একবার কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি পার্য্যমানে দূরে থাকুক, অপার্য্যমানেও তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টের বিষয়।" অক্ষয়কুমারের মহীয়সী সাধনার উপযুক্ত সঙ্কল্প। এইরূপ সঙ্কল্প ও সাধনা না হইলে সিদ্ধি কোথায়?

বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের কীর্ত্তি অক্ষয়। জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে জাতীয় উন্নতি তাঁহার জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য তিনি যে কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন তাহার কাহিনী বঙ্গ ভাষার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। তিনি যখন সাহিত্যসেবা ব্রত গ্রহণ করেন তখন বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা প্রশংসার্হ ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে তখন কুৎসিত কবিতার প্রাধান্য ছিল। তৎকালীন পাঠক সমাজের রুচিও বিকৃত ছিল। অক্ষয়কুমার গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ বিষয় সকল গদ্যে লিখিতে প্রয়াস পান এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন। তিনি ওজঃগুণসম্পন্ন বাঙ্গালা গদ্যের স্রষ্টা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি সেই তেজঃপূর্ণ ভাষার সাহায্যে বঙ্গবাসিগণকে নীতিশিক্ষা দিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যে তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজকে অনেক তত্ত্ব শিখাইয়াছেন। এখনও তাহার

চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বঙ্গীয় সমাজের সমূহ হিতসাধন করিতেছে। অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা ভাষাকে নবজীবন দিয়াছেন। অক্ষয়কুমার যখন বঙ্গ সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করেন তখন বঙ্গভাষা জরাগ্রস্ত ছিল বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গ ভাষাকে নবজীবন দান করিয়া তিনি স্বয়ং জরাগ্রস্ত হয়েন। অক্ষয়কুমারের এই অকাল বার্দ্ধক্যের কথা মনে উঠিলে স্বতঃই যযাতির পৌরাণিক কাহিনী মনে হয়। জরাগ্রস্ত যযাতি পুত্রের ঐকান্তিক ভক্তির জন্য জরামুক্ত হয়েন। পুরুর ন্যায় বঙ্গ ভাষাও উপযুক্ত পুত্রের জন্য গর্ব্বিত। কবি বোধ হয় সেই জন্যই "বঙ্গ ভাষার" মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—

কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয়কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥

তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি মাতৃরূপা বঙ্গ ভাষাকে জরামুক্ত করিয়া অক্ষয় যশের মালা পরাইয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করাতে বঙ্গদেশ ধন্য, বঙ্গভাষা অক্ষয়কুমারের দ্বারা সেবিত হইয়া ধন্য, আর অক্ষয়কুমার আপনাকে বঙ্গবাসী বলিতেন বলিয়া বঙ্গবাসী ধন্য!

বঙ্গের একজন কৃতী সাহিত্যসেবক, মহাপুরুষ অক্ষয়কুমারের সমুচিত সম্মানরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের তাদৃশ কারণ দেখি না। তৈল চিত্র, বা প্রস্তর বা পিত্তল মূর্ত্তি রক্ষা করিলেই স্মৃতি রক্ষা বা সম্মান করা হয় না। তিনি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের মনোরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাঁহারা পঞ্চভৌতিক দেহ চলিয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু তিনি মনের দ্বারা জীবিত রহিয়াছেন কারণ :—"স জীবতি মনো যস্য মনেন হি জীবতি।"

কথিত আছে তন্ত্রোক্ত সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ হয়েন তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে সকলই করিতে পারেন। তাঁহাদের করস্পর্শে ধুলি মুষ্টি স্বর্ণে পরিণত হয়। শূন্যে জীবের আবির্ভাব হয়; মরুভূমি তৃণ লতা পুষ্প ফলে সুশোভিত হয়। তাঁহাদের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে, লোকে হাসে কাঁদে। তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রে লোকে উদ্দীপ্ত হয়, শান্ত হয়। এমনি তাঁহাদের সাধনালব্ধ শক্তি। সাধনার এমনই মাহাত্ম্য, সিদ্ধির এমনই ঐন্দ্রজালিক শক্তি। মধুসূদন যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা ইহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

তাঁহার মন্ত্রপূত লেখনী স্পর্শে কতই না অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি "স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ সমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছেন। তাহা পাঠ কালে তাঁহার ইচ্ছায় "ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বর্ত্তমানের ন্যায় জ্ঞান হয়—তাঁহারই নির্দ্দেশে "দেব দানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়" তাঁহারই ইচ্ছায় "কখন বা বিস্ময় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুল-লোচন হইতে হয়।"

বাস্তবিক সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদন অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আজীবন ব্যাপী সাধনালব্ধ সমগ্র শক্তি তিনি মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য সমালোচনা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে অধিকন্তু তাহা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্যও নহে।

মধুসূদন কি প্রকার সঙ্কল্প লইয়া বঙ্গভাষায় উন্নতি সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কি পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা দেখা গেল। যে সকল সাহিত্য সেবকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কারকের বা নূতন পথ প্রদর্শকের গুরুভার লইতে চাহেন তাঁহারা মধুসূদনের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, নির্ভীকতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার বিবিধ ভাষার অগাধ জ্ঞানের কথা সতত স্মরণ করিবেন। কেবল প্রতিভার দোহাই দিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিকে যদি প্রতিভা বলা যায় তবুও কেবল তাহার সাহায্যে কোন কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয় না। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনা আবশ্যক। মধুসূদনের শতক্রটী সত্ত্বেও তিনি সাহিত্যের জন্য যে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য কিরূপ সাধনালব্ধ শক্তি লইয়া তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহ তাঁহার সিদ্ধির পরিচয়। বঙ্গ ভাষাকে তিনি সমৃদ্ধি-শালিনী করিয়া গিয়াছেন এবং অক্ষয় শব্দসম্পদ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যে গৌড়জন নিরবধি আনন্দে সুধা পান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং বঙ্গভূমির মনঃ কোকনদ কখনও মধুহীন হইবে না।

মধুসূদনের হৃদয় কাননে কত শত আশালতা শুকাইয়া মরিয়াছে সত্য। কিন্তু বঙ্গভূমির নিকট যে আশা তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। শ্যামা জন্মদা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহকে অমরতা দিয়াছেন। তিনি নরকুলে ধন্য। বঙ্গের সর্ব্বজন মনের মন্দিরে সদা তাঁহাকে স্মরণ করে। বঙ্গের অন্যতম প্রধান কবি তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়াছেন :—

লীলা সাঙ্গ করি   হ'লে অবসর

অহে বঙ্গ-কুল-রবি,

যত দিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি ;—
আকর্ণ পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুঙ্গংরঞ্জন ভান,
মধুচক্র সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ ;
আনন্দ লহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন মণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধবকুলে
বীর অবয়ব বীরভাষা প্রিয়
গউড় সন্ততি সার
প্রিয়ংবদ সখা প্রণয়ের তরু
কামিনী কণ্ঠের হার ;
সাহিত্য কুসুমে প্রমত্ত মধুপ
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

ভারতভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইলেও ভারতবাসী দরিদ্র। দরিদ্র ভারতে কৃষি বাণিজ্যের বহুল বিস্তার আবশ্যক। যে সকল মহাত্মগণ বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং দেশের ও দশের উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রামদুলাল সরকার এবং স্যর জেমসেট্‌জী জীজী ভাইয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের সঙ্কল্প ও সাধনার কথা যথা স্থানে পর্য্যায়-

ক্রমে তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের সিদ্ধির প্রসঙ্গ উপস্থিত রামদুলাল সরকারের জীবনের যে সময়ের কথা এখানে বলিতেছি সে সময়ে তিনি ভারতবর্ষের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সওদাগর। বিস্তৃত বাণিজ্য, প্রচুর অর্থোপার্জ্জন এবং ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা রামদুলাল সরকার জীবনকে ধন্য করিবেন আশা করিতেন। তাঁহার আশা ফলবতী হইয়াছিল। তাঁহার সৌভাগ্যের সময়ের কথা আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রামদুলালের নিজের চারি খানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল। এই জাহাজ দ্বারা তিনি মার্কিণ ও ইংরেজের দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন। চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও তাঁহার বাণিজ্য জাহাজের গতিবিধি ছিল। বণিকপ্রবর রামদুলালের সহিত সর্ব্বজাতীয় বণিকগণের কারবার ছিল। এক সময়ে তিনি য়ুরোপীয় বণিকগণকে তেত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া তাঁহাদের বাণিজ্যের সাহায্য করেন। তিনি ভারতে মার্কিণের বাণিজ্য বিস্তার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রামদুলাল মার্কিণ পোতাধ্যক্ষগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতজাত নানা পণ্যে তাঁহাদের জাহাজ পূর্ণ করিয়া দিতেন এবং তাঁহাদের আনীত পণ্যসমূহ ভারতের বাজারে লাভের সহিত বিক্রয় করিয়া দিতেন। কালে তিনি মার্কিণ বণিক সম্প্রদায়ের এক মাত্র প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তদ্দেশীয় বণিকগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। এমন কি কোন মার্কিণ বণিক, তাঁহার বাণিজ্যপোত রামদুলালের নামে নামাঙ্কিত করেন।

রামদুলাল সরকারের স্বদেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারের কাহিনী শুনিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি স্বীয় মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত বাণিজ্যে সত্য সত্যই লক্ষ্মী বাস করিতেন। চঞ্চলা কমলা রামদুলালের জীবদ্দশায় তাঁহার গৃহে অচলা

হইয়াছিলেন। কমলার প্রসাদে তাঁহার বাল্যের অনেক আশা সফল হইয়াছিল। তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অর্জ্জিত অর্থ ভক্ত ও নিষ্ঠাবান হিন্দুজনোচিত ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করেন। তাঁহার গৃহে বহুশত আশ্রিতজন নিত্য অন্ন পানে তৃপ্ত হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালায় কত আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসী পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। পুণ্যতীর্থ কাশীধামে তিনি শিবালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দু যে যে অনুষ্ঠান ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ড করিলে জীবনকে ধন্য ও সার্থক বিবেচনা করেন রামদুলাল স্বীয় অর্জ্জিত অর্থে তাহার প্রায় সকলই করিয়াছিলেন।

রামদুলাল সরকারের নশ্বর দেহের অবশেষ হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প, সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনী বঙ্গদেশে বহুকাল প্রচলিত থাকিবে এবং এই দাসত্বপ্লাবিত দেশে স্বাবলম্বন ও বাণিজ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিবে।

সিদ্ধি ও শক্তি প্রায় স্থলে একার্থবাচক। সিদ্ধপুরুষ শক্তিশালী। সদিচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি শক্তি সাহায্যে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পার্শী বণিক জেমসেট্‌জী লক্ষ্মীর কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভূত অর্থবল ছিল। তিনি সেই অর্থের দ্বারা দেশ বিদেশে অনেক হিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে স্বদেশ ও স্বদেশীয়গণের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৩৭ খৃঃ অঃ স্থুরাটে খণ্ডপ্রলয়ের ন্যায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বিংশতি সহস্র লোক পথের ভিখারী হয়। ইহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিবামাত্র তিনি নগদ ৩৫০০০৲ টাকা ও চাউল বিতরণের জন্য পাঠাইয়া দেন। পার্শী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দির সংস্কার

ও নির্ম্মাণের জন্য ৬০,০০০৲ টাকা তিনি দিয়াছেন। অশীতিসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত প্রশস্ত ধর্ম্মশালা অদ্যাপি বোম্বাই নগরীতে এই বণিকপ্রবরের দয়ার কথা প্রচার করিতেছে। দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তিনি প্রসূতিগণের জন্য এক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ স্যর জেমসেট্‌জী জীজী ভাই শিল্প বিজ্ঞান বিদ্যালয় তাঁহারই কীর্ত্তি। মহারাষ্ট্র প্রদেশে এই মহাপুরুষের ক্ষুদ্র বৃহৎ দানের অনেক কীর্ত্তি কাহিনী আছে। সে সকল দেখিলে ও শুনিলে নয়ন মন তৃপ্ত হয়। তাঁহার কীর্ত্তি কলাপের কথা শুনিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে ব্রিটিশ রাজ্যের ব্যরোনেটের উপাধি দেন। ১৮৪২ খৃঃ অঃ এই উপাধি বিতরণ উপলক্ষে বোম্বাইয়ের তদানীন্তন গভর্ণর স্যর জর্জ এন্‌ডারসন যাহা বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"The dignity of Knighthood has amongst natives of Europe been considered as most honourable. To obtain this distinction has continually been the ambition of the highest minds and noblest spirits, either by deeds of most daring valour or by the exercise of the most eminent talent.

"You, by your deeds for the good of mankind, by your acts of princely munificence to alleviate the pains of suffering humanity, have attained this honour and have enrolled among the illustrious of the land."

মহারাষ্ট্র প্রদেশে মহাপুরুষের পূজা হয়। যেখানে বীরত্বের আদর .ই সেখানে বীর জন্মে না। সেখানে মহাপুরুষের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভবে? বোম্বাইবাসিগণ, ১৮৫৬ খৃঃ অঃ ষষ্টি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে স্যর জেমসেট্‌জীর প্রতিমূর্ত্তি, তত্রস্থ টাউন হলে স্থাপিত করিয়াছেন।

১৩

ঐ মূর্ত্তির গলে কি সুন্দর জয়মাল্য রহিয়াছে। উহাতে যাহা লেখা আছে তাহা এই :—"Sir Jamsetjee Jeejeebhai, Knight, from British Government, in honour of his munificence and his patriotism." বোম্বাইবাসিগণ বীর পূজা করিয়াছেন—তাহার ফলে তাঁহারা ভারতের সুপুত্র জে, এন্, তাতাকে পাইয়াছেন। বীর পূজার এমনই ফল। আদর্শের এমনই মহিমা।

আদর্শের মহিমা অনন্ত। আদর্শের দ্বারা মানব অনুপ্রাণিত হয়। অবসন্ন মন প্রাণ উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যাঁহাদের সঙ্কল্প সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্যপ্রসঙ্গ কথিত হইল; কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় যুবকগণের নিকট তাঁহারা চিরকাল আদর্শ স্বরূপ থাকিবেন। কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে এই সকল কর্ম্মবীরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধনা করিতে পারিলে ভারতীয় যুবকগণ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। যুবকগণের জ্ঞানের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি বর্দ্ধিত হউক। তাঁহারা বীর পূজা করিতে শিক্ষা করুন। সিদ্ধপুরুষগণের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের শক্তি সঞ্চয় হইবে, কর্ম্মে আস্থা হইবে, সঙ্কল্প দৃঢ় হইবে সাধনায় প্রবৃত্তি হইবে, এবং ভগবানের কৃপায় সিদ্ধি নিকটতর হইবে। তখন দরিদ্র ভারতের সৌভাগ্যের উদয় হইবে, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

আরভেতৈব কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ,
কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে।

সমাপ্ত।